আর. এম. ব্যালেণ্টাইনের

# মার্টিন র‍্যাটলার

সংক্ষেপে অনুবাদ করেছেন

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলি কলম

৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট,

কলকাতা-১২

## ॥ ভূমিকা ॥

যে-ক'জন বিরলসংখ্যক সাহিত্যিক শিশুপাঠ্য ক্লাসিক অ্যাডভেঞ্চার রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আর. এম. ব্যালেন্টাইনের নাম অন্যতম। যদিও বাংলাদেশের শিশু-পাঠকদের কাছে ব্যালেণ্টাইনের পরিচয় 'কোরাল আইল্যাণ্ড', 'গরিলা হাণ্টার্স', কি 'ডগ ক্রুশো'র প্রণেতা হিসেবে, তবুও সমালোচকদের সঙ্গে একযোগে এ-কথা বলা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, 'মার্টিন র‍্যাটলার' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই কাহিনীর রোমাঞ্চকর ঘটনাস্রোতের কথা বাদ দিলেও অঙ্কলার সিদ্ধকৌশলের দরুণ এই গ্রন্থ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর ভিতর শ্রেষ্ঠ থেকে যাবে।

বহুদিন থেকেই আমার মনে এই ইচ্ছেটা ছিলো যে 'মার্টিন র‍্যাটলারের', তর্জমা করতে হবে; এবারে সেই-ইচ্ছার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও একটা ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত থেকেই গেলো যে কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মূল কাহিনীর কাঠামো বজায় রেখে সামান্য সংক্ষেপ করতে হ'লো। এইটুকুও হ'তো না, যদি-না প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্তের সক্রিয় ও অকৃপণ সাহায্য পাওয়া যেতো। তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতির যে-সম্বন্ধ তাতে সাধারণ কৃতজ্ঞতাবাচক শব্দ উচ্চারণ করলে দস্তুরমতো অন্যায় করা হবে।

আশা রাখি, 'মার্টিন র‍্যাটলার ছোটোদের ভালো লাগবে।

'রামধনু'-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধাভাজনেষু

## ॥ অথ মহাযুদ্ধ কথা ॥

মার্টিন র‍্যাটলার ছেলেটা যাকে বলে একের নম্বর। অন্তত তার পিশি ডরোথি গ্রাম্‌বিট তো সেই কথাই বলেন। এবং যেহেতু মার্টিন তাঁর কাছেই থাকে, সেই হেতু ছেলে হিসেবে সে কি প্যাটার্ণের, সেটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। কাজেই, ডরোথি-পিশির কথা মতো মার্টিন যে একটি 'সাংঘাতিক মন্দ ছেলে' তাতে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, অশফোর্ডের লোকেরা মার্টিন সম্পর্কে ডরোথি-পিশির মন্তব্যের কোনো প্রতিবাদ না করলেও, এমন লোক খুব অল্পই ছিলো, মার্টিনের সঙ্গে দেখা হলে স্মিত হেসে যে তাকে শুভেচ্ছা জানাতো না। সে যে খারাপ ছেলে, একথায় সায় দিয়েও তারা এমন ভাবে তাকে শুভেচ্ছা জানাতো যে দেখে মনে হতো, তার মতো ভালো ছেলে যেন দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই।

আসলে মার্টিন আদৌ খারাপ ছেলে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিলো তাদের। বুড়ো পাদ্রিসাহেব তো স্মিত হেসে সহৃদয় মন্তব্য করতেন যে, ছেলেটা একটা আস্ত শয়তান; অথচ, তিনি একথাও বলতেন যে বড়ো হলে সব দোষ শুধরে নেবে ছেলেটা। তাঁর মতামতের একটা বিশেষ দামও ছিলো।

কারণ তিনি প্রায় চল্লিশ বছর পাদ্রিদের স্কুলে কাটিয়েছিলেন। ছোটদের তিনি ভালোও বাসতেন খুব।

তাছাড়া বখাটে ছেলের মতো চেহারাও ছিলো না মার্টিনের। তুলতুলে গোলাপি চিবুক, গোলগাল মুখ, টিকোলো নাক, চওড়া কপাল—সব মিলিয়ে দেখতে ও সুশ্রীই। তবে চোখ খুললে পরই ওর চোখের তারায় লক্ষ দুষ্টু খেয়াল নাচতো অশান্ত বিদ্যুতের মতো, ঠোঁটে বাসা নিতো দুষ্টু হাসি, আর মগজে নানান বিদঘুটে বুদ্ধি। তখন সেই মার্টিনকে দেখে যদি কেউ বলে ছেলেটা খুব দুষ্টু, তা-হ'লে তার ভুল হয়েছে বলা চলবে না। আবার কোনো কিছু সম্পর্কে গভীর কৌতূহলী হয়ে উঠলে পর ওর সিরিয়াস চোখমুখ দেখে কেউ যদি ওকে দার্শনিক বলে, তাহ'লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ডরোথি-পিশি মোটেই ধনী ছিলেন না। তাই পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো মার্টিনের যখন স্কুলে পড়বার বয়েস হলো, তখন আরো প্রবল ভাবে নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন হলেন তিনি, কারণ, ওকে স্কুলে পাঠানোর মতো সঙ্গতি তাঁর ছিলো না। কিন্তু, ভাই-পোকে খুব ভালোবাসতেন বলেই ডরোথি-পিশির পক্ষে উপার্জনের পন্থা খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। ছ-বছর জারমেনিতে ছিলেন বলেই তিনি যে-রকম দ্রুতহাতে মোজা বুনতে পারতেন, তা শুধু স্বচক্ষে দেখলে পরেই বিশ্বাস করা সম্ভব। অল্প দিনের মধ্যেই খদ্দেরের সংখ্যা প্রচুর হয়ে যাওয়ায় ডরোথি-পিশিকে দিনরাত মোজা বোনা

নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হলো, আর মার্টিন র‍্যাটলার ভর্তি হলো গ্রামের স্কুলে।

ছোট্টো একটা জানলার পাশে একটি ইজিচেয়ারে বসে ডরোথি-পিশি মোজা বুনতেন। জানলা দিয়ে রোদ আর আলো এসে সারাদিনই ছড়িয়ে থাকতো তাঁর পিঠেকোলে। সেই জানলা দিয়ে প্রতিবেশিদের খেতখামার স্পষ্ট দেখা যেতো। ছোট্টো একটা ঝরণা বয়ে চলেছে গ্রামের মধ্যখান দিয়ে। তার ওপাশে চাষিদের ক্ষেত। তারই গা ঘেঁষে বনভূমির কাছে গোরু-ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় রাখাল ছেলেরা। দূর দিগন্তে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যেতো সমুদ্রের সুনীল আভাস।

দৃশ্যটা দেখবার মতো হলেও ডরোথি-পিশি সেদিকে একবারো তাকাতেন না এবং তাকালেও তিনি আদৌ দেখতে পেতেন কি-না সন্দেহ। চশমার সাহায্যে ভালো করে তাকালে পর ঘরের কোণের চুল্লিটা, তার পাশে শুয়ে-থাকা বেড়ালটা এবং সাদা দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ছবিটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না তিনি। ডরোথি-পিশির স্বামী ছিলেন জাহাজের কাপ্তেন।

স্কুলে গিয়ে মার্টিন সর্বপ্রথম যে গোলমালে জড়িয়ে পড়লো, তার উৎসসন্ধানে বেরোলে আগুনকেই দায়ী করতে হয়।

মাস্টারমশায় বললেন, মার্টিন র‍্যাটলার, যাও তো, চুল্লিতে

কিছু কয়লা গুজে দিয়ে এসো। আর, হ্যাঁ, দেখো, আগুনের ফুলকি যেন আবার চারদিকে না ছড়িয়ে যায়।

শুনেই তো মার্টিন লাফিয়ে উঠলো। ক্লাসের সব ছেলের সঙ্গে সেও তখন বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়েছিলো। আগুনের আঁচ বাড়িয়ে দেবার ছুতোয় তার হাত থেকে তো একটু রেহাই পাওয়া গেলো! মহা সতর্ক চোখে ও আগুনের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে কয়েক টুকরো কয়লা চুল্লিতে ফেলে দিলো। ধীরে সুস্থে তারপর বার তিনেক ফিরে তাকালো মাষ্টারমশায়ের দিকে। অতঃপর আঁচ বাড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো একটু ক্ষণের জন্যে। আবার কিছু কয়লা গুঁজে দেওয়ার উদ্যোগে সে তন্ময় হলো। আর, ঠিক তক্ষুনি ক্লাসের সবচেয়ে ধেড়ে ছেলে বব ক্রোকার চেঁচিয়ে উঠলো, মাস্টারমশায়, র‍্যাটলার আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে।

তক্ষুণি মাস্টারমশায় টেবিলের উপরে বেতটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন, যাও, জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো আগের মতো।

বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে-দাঁড়াতে হঠাৎ মার্টিনের চোখে পড়লো, তার তর্জনীতে কয়লার দাগ লেগে আছে। পলকের জন্যে ওর ঠোঁটে একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেলো: শান্তশিষ্ট ভাবে তাকিয়ে সে দেখতে পেলো মাস্টার মশায় ক্লাসের অন্য একটা ছেলেকে নিয়ে পড়েছেন।

'দৈবাৎ লেগে গেলো ভাই, কিছু মনে কোরো না' এমনি

ভাবে ভদ্র সুবোধ ছেলের মতো মার্টিন পাশের ছেলেটার নাকে, কপালে, গালে তার তর্জনী বুলিয়ে দিলো।

—এস্কিমোরা কোথায় থাকে বলো দিকিন, মাস্টারমশায় পিছনের বেঞ্চের একটা ছেলেকে শুধালেন।

ক্লাসের এক কোণা থেকে ইতিমধ্যেই একটি বাচ্চা ছেলে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

হাসি শুনেই এতো জোরে মাস্টারমশায় 'চুপ করো' বলে গর্জে উঠলেন যে ছেলেটি ভয়ে একেবারে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

—এস্কিমোরা এশিয়ায় থাকে স্যর। পিছনের বেঞ্চির ছেলেটা উত্তর দিলো।

পাশের ছেলেকে শুধালেন মাস্টারমশায়, তুমি বলো।

—তুরস্কে, মাস্টারমশায়।

—তুমি বলো তো। তুমি···তুমি! আরে! জন ওয়ার্ড,—রাগে চেয়ার থেকে তেড়ে জোরে উঠে দাঁড়ালেন মাস্টারমশায়, এর মানে কী?

—কিসের স্যর? কাঁপতে কাঁপতে জন ওয়ার্ড যখন এই কথা কটি উচ্চারণ করলো, তখন হাসি চাপতে গিয়ে ক্লাসের সকলের দম ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—তোমার মুখের, স্যর! হনুমান সাজালো কে তোমায়?

—জানিনে তো। বলতে-বলতে জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মুছলো জন, এবং বলা বাহুল্য, জামায় কয়লার দাগ লাগতে দেরি হলো না একটুও।

একটা তুমুল হাসির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো সারা ক্লাস। মাস্টারমশায় গর্জন করে উঠলেন, চুপ করো। সঙ্গে সঙ্গে আবার শান্ত হয়ে গেলো ক্লাস। আলপিন পড়লেও শব্দ হবে বোধ হয়, এমন অবস্থা ক্লাসের।

—মার্টিন র‍্যাটলার, এ তোমার কাজ ? অস্বীকার কোরো না। তোমার আঙুলে আমি কয়লার দাগ দেখেছি। এখানে এসো।···হ্যাঁ, এবার বলো, এ তোমার কাজ ?

মার্টিন র‍্যাটলার যতো মন্দই হোক মিথ্যে কথা বলে না কখনো। ডরোথি-পিশি বারবার ওকে বুঝিয়েছেন যে, কোনো অপরাধ করে মিথ্যে কথা বললে অপরাধ তো ডবল হয়ে যায়ই, তাছাড়া তখন আর কোনো মার্জনা থাকে না। ডরোথি-পিশির পরিশ্রম যে বৃথা হয়নি, তার প্রমাণ হলো, মার্টিন মিথ্যে কথা বলে মার্জনা লাভের বদলে সর্বদাই মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করে। মাষ্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ও বললো, হ্যাঁ স্যর, আমিই করেছি।

—হুঁ···আচ্ছা, জায়গায় গিয়ে বোসো। কিন্তু খেলার সময়ে তোমাকে স্কুলে থাকতে হবে, কোথাও বেরোতে পারবে না।

মার্টিনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। এটা সে আশা করেনি। ভারি মনে সে গিয়ে তার সীটে বসলো। আর এর একটু পরেই ঢং-ঢং করে বাজলো ছুটির ঘণ্টা। বব ক্রোকার মার্টিনের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ফিশফিশ করে বললো, তারপর র‍্যাটলার সাহেব, কেমন আছেন ? হ্যাঁ,

ভালো কথা। আমি এক্ষুণি আপনার শাদা বিড়ালটাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যাবো। আপনি এসে কি অনুগ্রহ করে একটু দর্শনও করবেন না ?

বব ক্রোকারের সঙ্গী ছেলেরা একথা শুনে যখন মুচকি হাসলো, তখন মার্টিণের বুঝতে বাকি রইলো না যে, বব খামোকা ভয় দেখায়নি। ও যে-প্যাটার্ণের ছেলে তাতে কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। তক্ষুণি ছুটে গিয়ে শাদা বিড়ালটাকে রক্ষা করবার উদগ্র ইচ্ছে মাস্টারমশায়ের ভারিক্কি মুখের দিকে তাকিয়ে সে বহু কষ্টে দমন করলো। ও কোনো মতে নিজেকে সামলে জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্য ছেলেরা বেশ হৈ-হল্লা করে খেলা করছে মাঠে।

বই থেকে মুখ তুলে ভারিক্কি গালায় মাস্টারমশায় বললেন, মার্টিন, জানলার দিকে তাকিও না। ওদিকে পিছন ফিরে থাকো।

মার্টিনের দৃষ্টি তখন মাঠ ছাড়িয়ে আরো দূরে গিয়ে পড়েছে। অনুনয় করে সে বললো, কিন্তু মাস্টারমশায়······

টেবিলের উপরে সজোরে বেত ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টারমশায়. আমি তোমাকে জানলার দিকে পিছন ফিরে থাকতে বলছি মার্টিন।

—মাস্টারমশায়! মাস্টারমশায়! আমাকে বাইরে যেতে দিন। ঐ যে বব আমাদের বিড়ালটা নিয়ে চলেছে! বেড়ালটাকে ও জলে ডুবিয়ে মারবে। আমি জানি, ও বিড়ালটা জলে ডুবিয়ে মারবে—আমাকে এইকথা বলে গেছে ও।

যদি ও ওটাকে জলে ডুবিয়ে মারে, পিশিমণি তবে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবেন, কারণ আমাকে ছাড়া দুনিয়ায় যদি আর কাউকে পিশিমণি ভালোবাসেন তো ঐ বিড়ালটাকে। বিড়ালটা আমাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে স্যর! আর আপনি যদি আমাকে এখন বাইরে বেরোতে অনুমতি না দেন, তবে···তবে আপনি পিশিমণিকে হত্যার দায়ে পড়বেন, স্যর।

এই কথা বলে উত্তেজনায় জ্বলজ্বল মার্টিন এক লাফে মাস্টারমশায়ের চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালো। মাস্টারমশায় প্রথমটা অবাক হলেন, তারপর রাগে লাল হলেন, শেষে মুচকি হেসে শান্ত গলায় উত্তেজিত মার্টিনকে বললেন, আচ্ছা, তুমি যেতে পারো এবার।

দ্বিরুক্তির আর প্রয়োজন পড়লো না। এক ধাক্কায় দরজা খুলে গেলো বিদ্যুতের মতো, আর একলাফে মার্টিন খেলার মাঠ পেরিয়ে হাওয়া। যে কাঁটাতারের বেড়াটা দিয়ে স্কুলের খেলার মাঠ অন্যান্য মাঠ থেকে আলাদা করা ছিলো, সেটি মার্টিনের পক্ষে এক লাফে পেরিয়ে যাবার মতো ছিলো না, তার অনুপাতে প্রচুর উঁচু ছিলো। মার্টিন কিন্তু পার্বত্য হরিণের মতো একটা লাফ দিলো, এবং বেড়াটার বেশ খানিকটে উপর দিয়ে গিয়ে অন্যপাশের মাটিতে পড়লো তালগোল পাকিয়ে, আর ঢালু জমি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কুমড়ো পটাশের মতো বেশ খানিক দূর চলে গেলো। দৌড়ে গেলে হয়তো এর চেয়ে জোরে যেতে পারতো না ও। পলকে মার্টিন উঠে দাঁড়ালো এবং অন্য কেউ কোনো কিছু ভেবে উঠবার আগেই

দেখা গেলো, ও মাঠের অর্ধেকখানি পেরিয়ে গেছে এবং প্রায় ববের পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে এতো কাছে দেখে প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খেলো বব, তারপর তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করলো এবং ওর সব সাঙ্গোপাঙ্গোরা ও স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা সবাই হল্লা করতে-করতে ওর অনুসরণ করলো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সবাই পাহাড়ে নদীটির তীরে এসে দাঁড়ালো। বিদ্যুতের মতো ব্রেক কষে নিজেকে সেখানে থামালো বব এবং একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের মুখ দেখে নিয়ে আলগোছে শাদা বিড়ালটার ঘাড় ধরে জলে ফেলবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলো।

—ছেড়ে দাও বব, ছেড়ে দাও ভাই। এরকম কোরো না, সত্যি বলছি ভাই···আরো জোরে দৌড়োবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠলো মার্টিন।

বব কিন্তু হি-হি করে হেসে উঠে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো বিড়ালটাকে এবং বিড়ালটা যখন বার কয়েক শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ঝপাং করে জলে পড়লো, তখন সে চেঁচিয়ে উঠলো, বহুৎ আচ্ছা, ঠিক হ্যায়!

বিড়ালের মৃত্যুর পক্ষে এই ব্যাপারটিই যথেষ্ট হলেও শাদা বিড়ালটা কিন্তু মরলো না। একবার তলিয়ে গিয়ে যখন সে ভেসে উঠলো, তখন তার ছোটো বুকটা দ্রুত তালে বেজে উঠলো এবং মার্টিন এসে পৌঁছুনোর আগেই সে আবার তীরে এসে পড়লো। ভাগ্যিস বেশি গভীর জলে পড়েনি। যদি পড়তো তা-হলে যে কী হতো, তা ঈশ্বরই জানেন।

কিন্তু যখন বিড়ালটা পাড়ে উঠে এলো তখন বোঝা গেলো কী সাংঘাতিক বদলে গেছে সে। মোটাসোটা গোলগাল বিড়ালটা ভিজে ন্যাকড়ার মতো কুঁকড়ে-মুকড়ে গেছে যেন। পাড়ে এসে পৌঁছুবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিড়ালটাকে আবার পাকড়াও করলো বব, তারপর ওটাকে চক্রের মতো বনবন করে মাথার উপরে ঘোরালো বার কয়েক। শেষে অন্য সকলের প্রতিবাদে কোনো কান না দিয়ে আবার ওটাকে জলে ফেলবার উদ্যোগ করলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই মার্টিন লাফিয়ে উঠে ঢ্যাঙা ববের শার্টের কলার টেনে ধরলো, তারপর এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিলো ওকে। আর সেই অবসরে বিড়ালটা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বড়ো বড়ো ঘাসের ভিতরে গিয়ে লুকোলো।

ওজনে আর লম্বায় মার্টিনের চেয়ে ডবল ছিলো বলে সহজেই বব তার বেঁটেখাটো প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো এবং মার্টিনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাগে কাঁপতে-কাঁপতে ঘুষি পাকালো। অন্য ছেলেরা কিন্তু তখন ববকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। বললো, শেম! শেম! বেকায়দায় পেয়ে মারতে লজ্জাও করে না! ছি-ছি-ছি!

এমনিতে যেমন ছেলেই হোক না কেন, একথায় ববের খুব আঁতে ঘা লাগলো। ছেড়ে দিলো মার্টিনকে। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তবে তৈরি হয়ে আস্থক ও। দেখে নোবো কেমন পালোয়ান!

—এই তো পাকা খেলোয়াড়ের মতো কথা। লঙ্কাফোড়ন

দিলো কেউ-কেউ। মার্টিন মজা দেখিয়ে দাও তো ববকে। মনে রেখো, তোমার বিড়ালের কী হাল করেছে ও।

অন্যরা কিন্তু মার্টিনকে নির্ঘাৎ হারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো, মার্টিন, ও সবে কান দিয়ো না তুমি। বাড়ি ফিরে যাও বরং। ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে তুমি কিছুতেই পারবে না।

এবার সাংঘাতিক রকম রেগে উঠলো বব। বললো, তবে চলে এসো যার ইচ্ছে। বব তোদের থোড়াই কেয়ার করে।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার মাথাব্যথা ছিলো না কারুর। কারণ, একথা তো আর কারো অজানা ছিলো না যে, বব হলো স্কুলের সবচেয়ে ঢ্যাঙা আর জোয়ান ছেলে। অবশ্য কেউ-কেউ জানতো যে সবচেয়ে জোয়ান হলেও বব সবচেয়ে সাহসী নয়। তবুও খামোকা-খামোকা ভূতের কিল খাওয়া সবারই অপছন্দ ছিলো। তাই ববের চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করলো না।

বব যখন দেখলো যে কেউ তার সঙ্গে লড়াই করতে রাজি নয়, এমন কি মার্টিনও না, তখন সে আবার বিড়ালটার দিকে এগিয়ে গেলো। বিড়ালটা তখন তার ভিজে শরীর ঘাসে ঘষে ঘষে গরম হবার চেষ্টা করছিলো। বিড়ালটার দিকে যেতে যেতে বব মার্টিনকে উস্কে দিতে চাইলো, এই দ্যাখো মার্টিন, আবার কী কাণ্ড হয়।

অনুনয় করে বললো মার্টিন, না, না, বব, বিড়ালটাকে নিয়ে আর নাড়াচাড়া কোরো না। তুমি যা চাও, সব আমি

দোবো। মারবেল, ঘুড়ি, লাটাই—যা বলবে, সব, সব দোবো। কিন্তু বেড়ালটাকে খামোকা মেরে ফেলো না।

বব যে ওর অনুনয়ে কান দিয়েছে তেমন কোনো লক্ষণ ববের হাবভাবে দেখা গেলো না। তখন মার্টিন আবার বললো, মারামারি করাটা আমি পছন্দ করিনে বলে, তবে তুমি যদি নেহাৎই মারামারি করতে চাও, তবে আমি তাতে রাজি আছি। শুধু পাঁচটা মিনিট আমাকে সময় দাও জিরোতে, তারপর দেখবো তোমার গায়ে কেমন জোর আছে।

অবাক হয়ে বেঁটেখাটো প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকালো বব। তারপর বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার কথাতেই রাজি আছি। কিন্তু যদি তুমি আমাকে হারাতে না পারো তবে কিন্তু বিড়ালটাকে আবার জলে ফেলে দোবো, এই বলে রাখছি। এই কথা বলে সে নীরবে তার শার্ট গেঞ্জি খুলতে লাগলো।

ববের সঙ্গে মারামারি করতে বারবার মার্টিনকে বারণ করলো সবাই। কিন্তু তবুও যখন মার্টিন কারো কথা শুনবার লক্ষণ দেখালো না, তখন ওরা মার্টিনকে জামা-কাপড় খুলতে সাহায্য করতে লাগলো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে দাঁড়ালো দুজনে। ঘুষি পাকিয়ে দুজনেই ঘুরতে লাগলো চক্রাকারে—যেন দুই বাচ্চা মুষ্টিযোদ্ধা বক্সিং লড়বার পায়তাড়া কষছে। পরমোৎসাহে অন্যরা দুজনকে ঘিরে দাঁড়ালো। ঠিক সেই মুহূর্তে, ঝড়ের আগেকার সেই ভীষণ শ্রান্ত আবহাওয়ার মধ্যে শোনা গেলো

শাদা বিড়ালটার মিহিগলার মিউ-মিউ ডাক। ঘাষে শরীর ঘষে-ঘষে সে চাঙা হয়ে নিচ্ছে। বেড়ালের গলা যে মার্টিনের বুকে কতোটুকু সাহস এনে দিলে তা কেউ কল্পনাও করতে পারলো না এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো নাকে-মুখে পর-পর কয়েকটা ঘুষি খেয়ে বব ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

পরক্ষণেই মার্টিন বুঝতে পারলো যে এভাবে আর তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো যাবে না। কারণ যে মুহূর্তে বব তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুরোদ বুঝে নিলো, সেই মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়ালো মাটি থেকে এবং মার্টিনের নাকের ডগায় আর বুকে দুটো সাংঘাতিক রকম ঘুষি দিলো বসিয়ে। মার্টিনের রাগের উত্তাপ বাড়তে আর একটুও দেরি হলো না। চ্যাচামেচি করে, হাততালি দিয়ে অন্যরা যখন জায়গাটা সরগরম করে তুললো, তখন দেখা গেলো মার্টিন আর বব রীতিমতো মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

এ-রকম লড়াই কচিৎ-কখনো হাজারে একটা চোখে পড়ে। বিলেতে যেমন ওয়াটারলুর লড়াই তুমুল হুলুস্থুলু সৃষ্টি করেছিলো, এই লড়াইও তেমনি ভীষণ হই-চই তুললো স্কুলের ছেলেদের মধ্যে। এমন লড়াই স্কুলের জন্ম-বয়েসে আর হয়নি। এতো রীতিমতো চিরস্মরণীয়। কিংবা অবিস্মরণীয়ও বলা যায়। স্কুলের সবচেয়ে ধেড়ে ছেলেও সেকথা স্বীকার করেছিলো পরে। আর, এর পরে অনেক বছর ধরে ছোটোদের ইতিহাসে অপ্রতিহত সম্মানে এই লড়াই মহাযুদ্ধের গৌরব পেয়েছিলো। এর পরে কোনো ছোটোখাটো খণ্ডযুদ্ধ

হলেই সবাই মন্তব্য করতো, না, মহাযুদ্ধের পর থেকে আর ওরকম একটা লড়াই হতে দেখলুম না।' বব সেই থেকে একজন উজ্জ্বল চিহ্নিত যোদ্ধার সম্মান পেলো, আর মার্টিন পেলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলের। সে যেন অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের নায়ক—যার মাথার পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে গুলি চলে যায়, পায়ের এক ইঞ্চি দূরে কেউটে সাপ ছোবল মারে, এবং আরো কতো সব রোমহর্ষক ও ভীষণ-ভীষণ ঘটনা ঘটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মরে না কখনো।

মার্টিনের বরাত ভালো যে, যে-জায়গাটায় লড়াই হচ্ছিলো, সে-জায়গাটা তার পক্ষে সুবিধেরই হয়েছিলো। জায়গাটা ছিলো অসমান। উঁচুনিচু ঢিবি আর গর্তে ভরা। তাই ববকে বারবার হোঁচট খেয়ে পড়তে দেখা গেলো। তাতে ববের শরীর আর অক্ষত রইলো না, জায়গায় জায়গায় বেশ ছড়ে গেলো। প্যান্টটা আঁটোসাঁটো হওয়ায় মার্টিন কিন্তু নেকড়ের মতো ক্ষিপ্র হতে পেরেছিলো। তাই কচিৎ এক আধবার আছাড় খেয়ে পড়লেও রবারের বলের মতো পলকের মধ্যে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে তার বিলম্ব হচ্ছিলো না।

শেষে বব আর থাকতে না পেরে অকস্মাৎ মার্টিনের কাছে ছুটে এসে সাংঘাতিক এক ঘুষি মেরে মার্টিনকে মাটিতে ফেলে দিলো। সেই মুহূর্তে একটা গর্তে পা আটকে যাওয়াতে সে নিজেও মাটিতে পড়ে গেলো। অবশ্য তৎক্ষণাৎ আবার দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। মার্টিনতো একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠলো এবার। দু-এক পা পিছিয়ে গিয়ে সে অকস্মাৎ

জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছুটে এলো ববের দিকে। তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠে শূন্যে ঝাঁপ দিলো ও মাথা আর ঘুষি বাড়িয়ে, যেন সে সাঁতার কাটার জন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই সে এসে ধাক্কা মারলো বব ক্রোকারের বুকে। এর ফল কিন্তু সাংঘাতিক হলো। বব মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যেতে থাকলো নদীর দিকে। মার্টিনও তথৈবচ। তারপর দুজনেই গিয়ে পড়লো একেবারে গভীর জলে। মুহূর্ত পরেই মার্টিনের হাত-মুখ জলের উপর দেখা গেলো।

যখন বব ক্রোকারের চোখ-মুখ জলে ভেসে উঠলো, দেখা গেলো, তাতে কোনো রকম চেতনার চিহ্ন নেই যেন। করিৎকর্মা মার্টিনের চূড়ান্ত আক্রমণ তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে যেন।

মার্টিন কিন্তু অবস্থা ভালো নয় দেখে, ববকে টেনে তীরে নিয়ে এলো। তীরে উঠে একটু দম নিয়ে মার্টিন বললো, বব, সত্যিই আমি দুঃখিত যে তোমার সঙ্গে এভাবে লড়াই করতে হলো। আমি হয়তো কিছুই করতুম না, যদি তুমি বিড়ালটাকে ছেড়ে দিতে। তুমিই আমাকে মারামারি করতে বাধ্য করেছো। এসো, আমরা সব ঝগড়াঝাটি ভুলে গিয়ে আবার বন্ধু হই।

বব কোনো উত্তর না দিয়ে জামা কাপড় পরতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মার্টিন তখন আবার বললো, বব, খামোকা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না। আমি অন্যায় কিছুই করিনি।

মারামারি করতে হলো বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এসো, হাতে হাত দাও।

তবুও বব নীরব দেখে ছেলেদের মধ্য থেকে কেউ-কেউ বলে উঠলো, বব, ওরকম মুখ গোমড়া করে থেকো না। হাতে-হাত দিয়ে ঝগড়ার কথা ভুলে যাও। এবার মার্টিন তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে, পরের বারে তুমি ওকে হারিয়ে দিয়ো—তাহ'লেই তো হবে!

—উহু! তোমরা সকলেই ভুল করেছো। মেথুসেলার আমলে জন্ম হলেও বব ক্রোকার কখনো মার্টিন র‍্যাটলারকে হারাতে পারবে না।

গলার স্বরটা যেদিক থেকে এলো, মুহূর্ত মধ্যে সকলের চোখ সেদিকে গিয়ে পড়লো। এই প্রথম ওদের খেয়াল হলো যে, মার্টিনদের এই লড়াইয়ের সাক্ষী হিসাবে একজন মধ্যবয়েসী নাবিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার মৃদু হাসি। হাতে একটা তামাকের পাইপ। লোকটা খুব লম্বা, আর শক্তসমর্থ। খুব সহজ তার চালচলন।

ছেলেদের দিকে এগোতে-এগোতে সে আবার বললো, মার্টিন, তোমার হাত দুটো যতো দিন আছে কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না। তারপর বব ক্রোকারের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলে চললো, মার্টিন র‍্যাটলারের কাছে হেরেছো বলে তোমার গর্ব হওয়া উচিত। এগিয়ে এসে হাতে হাত দাও। হ্যাঁ, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কাজ। না, না,

মারামারি করার জন্যে তুমি যে দুঃখিত হয়েছো সে কথা বলে কোনো কাজ নেই। মিথ্যে কথা তোমাকে বলতে হবে না। চলো মার্টিন, বাড়ি যেতে-যেতে তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক। আমার নাম হলো বার্নি ও' ফ্লানাগান।

মার্টিনদের বাড়ি অকুস্থল থেকে বেশি দূরে না হলেও, তারই মধ্যে বার্নি ওকে এমন সব মজার-মজার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বললো যে, মার্টিনের ভয়ানক ইচ্ছে হতে থাকলো, নাবিক হয়ে সেও বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রে। মার্টিনদের গাঁয়ের পাঁচ মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে বিল্টনে প্রায়ই যেতো মার্টিন। সেটি একটি সামুদ্রিক বন্দর। এ ছাড়া মার্টিনের বয়েস তখন মাত্র দশ বছর হলেও বার্নি বললো যে, এখন থেকেই মার্টিনকে উপার্জনের কাজে ব্যস্ত হওয়া উচিত। মার্টিন যদি চায় তবে বার্নি মার্টিনকে তাদের জাহাজে একটা কেবিন-বয়ের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মার্টিন জানালো যে, ডরোথি-পিশি কোনো ক্রমেই তাকে নাবিক হতে দেবেন না। সমুদ্রের প্রতি তাঁর নাকি ভয়ানক রাগ। পিশেমশাই তো সমুদ্রেই মারা গেছেন কি-না।

বিদায় নেবার আগে অবশ্য বার্নি বারবার বলে গেলো, মার্টিন যেন অবশ্যি-অবশ্যি বিল্টনে গিয়ে বার্নিদের জাহাজ দেখে আসে। সেখানে বেশ গল্প করা যাবে। ইতিমধ্যে ডরোথি-পিশিকে সে যেন নানান ভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার সম্মতি আদায় করে ফেলে।

## ॥ জাহাজ-ডুবির পরে ॥

সেই মহাযুদ্ধের পর চার বছর কেটে গেছে। মার্টিন এখন লম্বা-চওড়া খুব। সারা ইস্কুলের সে একমাত্র নায়ক এখন—সাহসে-বুদ্ধিতে আর কোনো ছেলে ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। আরেকটা তার মহৎগুণ—বিপদে সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে পারে পরিত্রাণের কৌশল।

বব ক্রোকার এখনো স্কুলে পড়ে। ভিতরে গূঢ় উদ্দেশ্য থাকলেও বাইরে সে মার্টিনের ভয়ানক ভক্ত। মনে মনে অবশ্য মার্টিনের প্রতি তার সাংঘাতিক বিদ্বেষ। মহাযুদ্ধের দিনের কথা সে এখনো ভুলতে পারেনি।

একদিন বব আর মার্টিন বিণ্টনের বন্দরে জাহাজ দেখতে গেলো। ডরোথি-পিশির অসম্মতি বলে মার্টিন সমুদ্রে যেতে পারেনি বটে, কিন্তু প্রায়ই সে বিণ্টনের বন্দরে এসে দূরগামী জাহাজগুলি দেখে যায়।

সেদিন ওরা যখন বন্দরে এসে পৌঁছুলো, তখন 'ফায়ারফ্লাই' নামে একটা জাহাজ 'সায়ুথ সী'তে যাত্রার তোড়জোড়ে ভয়ানক ব্যস্ত। বব ক্রোকারের সঙ্গে মার্টিন জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো এবং কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্, বার্নি ও' ফ্লানাগানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তার। বার্নি 'ফায়ার ফ্লাই' জাহাজে

কাজ নিয়েছে এবার। বার্নির সঙ্গে দু-এক কথার পর বার্নি জাহাজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো—অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়বে তো।

বার্নি চলে যেতেই বব বললো, মার্টিন, এক কাজ করলে হয় না? একটা নৌকো নিয়ে, চলো আমরা খানিক ঘুরে আসি।

—ঠিক বলেছো, বললো মার্টিন। বেশ মজা হবে তা হলে।

নৌকো ভাড়া নিতে গেলে কিন্তু নৌকোর মালিক ওদের সাবধান করে দিলো, হাওয়া খুব জোর বইছে। তোমরা বার-দরিয়ায় গিয়ে পড়তে পারো।

বব ক্রোকার হেসেই উড়িয়ে দিলো সে কথা। বললো, যাও মার্টিন, নৌকোয় গিয়ে ওঠো। আমি আসছি এক্ষুণি।

তীরের খুঁটিতে নৌকোর দড়ি বাঁধা ছিলো। সেটা খুলে হাতে নিয়ে সে মালিককে বললো, আমি নৌকোয় উঠলে পর তুমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ো।

বলতে-বলতে সে নৌকোর মালিককে দড়িটা দিতে গেলো এবং ইচ্ছে করেই দড়িটা সে হঠাৎ ছেড়ে দিলো। এমন ভাব দেখালো যেন দৈবাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেছে।

—মার্টিন, শীগগির,—চিৎকার করে বললো বব, ঐ শেকলটা ধরে ফেলো, শীগগির।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাহাজের পাশ থেকে নৌকোটা স্রোতের টানে তীরের মতো বেরিয়ে গেলো বারদরিয়ার দিকে। বিমূঢ় মার্টিন সম্বিত ফিরে পেয়েই

নৌকোর মুখটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তখুনি হাওয়া এলো তুমুল বেগে। অসহায় মার্টিন বুঝতে পারলো তার সমস্ত প্রচেষ্টাই এবার নিষ্ফল হবে। তখন সে নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, বব, ভয় নেই, আমি সায়ুথ পয়েণ্টের কাছে গিয়ে নৌকো ভেড়াবো। শীগগির দৌড়ে গিয়ে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

সায়ুথ পয়েণ্ট অন্তরীপ খুব সংকীর্ণ হয়ে এসে বিস্টন বন্দরের তিন মাইল দূরে সমুদ্র ছুঁয়েছে। সাধারণ আবহাওয়ায় অবশ্য ওদিকে নৌকো চালালে কোনো ভয়ের সম্ভাবনা থাকেনা। তাছাড়া, বন্দরের সর্বত্র মার্টিন র‍্যাটলার তার স্বাস্থ্য আর সাহসের জন্যে বিখ্যাত ছিলো। তাই তার নিরাপত্তার জন্যে বন্দরের লোকেরা একটুও মাথা ঘামালো না। ফায়ার ফ্লাইয়ের নাবিকরাও নিজেদের সমুদ্রযাত্রার কাজে এতো ব্যস্ত যে, ওদের দিকে কোনো খেয়ালই করলো না।

সায়ুথ পয়েণ্ট ডাঙা দিয়ে যেতে হলে চার মাইল দূর। বব তক্ষুণি দ্রুত পায়ে সেদিকে ছুটে চললো।

কিন্তু আবহাওয়া ক্রমশঃ ঝড়ো হয়ে এলো। দিগন্তে জমতে লাগলো পুরু মেঘ। হাওয়া রীতিমতো উদ্দাম হয়ে উঠতে সুরু করে দিলো। হাওয়ার দরুণ সরাসরি পয়েণ্টের দিকে নৌকোর মুখ স্থির রাখা মার্টিনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। তবু সে নির্ভীক মনে দাঁড় বাইতে শুরু করে দিলো। কিন্তু নৌকো পয়েণ্টের দিকে যতোই এগোতে থাকলো, ততোই সে ভালো করে বুঝতে পারলো যে, ডাঙা থেকে অনেক দূর

দিয়েই তার নৌকো যাবে, তাই বলে সে হাল ছেড়ে দিলো না। প্রবল হাতে দাঁড় টেনে চললো সে। কিন্তু কোনো ফল হলো না তাতে। হাওয়া তার নৌকোকে দূর সমুদ্রে টেনে নিয়ে চললো।

খানিকক্ষণ পরে বব পয়েণ্টে পৌঁছে দেখলো. মার্টিনের ছোট্টো নৌকোটা বারদরিয়ায় দিগন্তের কাছে ছোট্টা একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

এটা মার্টিনের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, 'ফায়ার ফ্লাই'তে বার্নি ও ফ্লানাগান ছিলো। বব ক্রোকার যখন সংবাদটা শহরে নিয়ে এলো, কেউ তখন নৌকো করে সেই ঝড়ো সন্ধ্যেয় বার-দরিয়ায় পাড়ি দিতে সাহস করলো না। নৌকো তখন দৃষ্টির বহু দূর বাইরে চলে গেছে, আর হাওয়া রীতিমতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বার্নি ও' ফ্লানাগান ববকে ভালো করে প্রশ্ন করে কোন্‌দিকে মার্টিনের নৌকো গেছে সেটা কম্পাস দিয়ে বুঝে নিলো এবং অবশেষে যখন 'ফায়ারফ্লাই' বন্দর ছেড়ে সমুদ্রযাত্রায় রওনা হলো, তখন সে জাহাজের মাস্তুলের ওপরকার পাহারা-মাচায় দূরবীন ধরে সমুদ্রে ছোটো নৌকোটার সন্ধান করতে লাগলো।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। চারদিকে তাকিয়ে যখন বার্নি সমুদ্রের শাদা ফেনা ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেলো না, তখন তার মনে হতাশা জমতে শুরু করে দিলো। মাস্তুল থেকে নেমে এসে সে ডেকে দাঁড়ালো। ঠিক সেই মুহূর্তে

জাহাজের পাশে ছোট্টো একটা নৌকোকে ভাসতে দেখা গেলো। নৌকোতে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। বার্নির চোখ না পড়লে জাহাজটার সঙ্গে নির্ঘাৎ নৌকোটার ধাক্কা লাগতো।

চেঁচিয়ে সারেঙকে নৌকোটার কথা বলেই সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো।

মার্টিনের যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন সে দেখতে পেলো, বার্নি তার পাশে বসে পাইপ টানছে। সে অনেক চেষ্টা করেও মার্টিনকে শান্ত করতে পারলো না। ডরোথি-পিশির মনের কথা ভেবে মার্টিন রীতিমতো পাগল হয়ে উঠলো। পিশিমণি যখন শুনবেন যে একটা ছোটো নৌকোয় করে সে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়েছে, তখন যে কী অবস্থা হবে ভাবতেও মার্টিনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। উত্তেজিত হয়ে সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললো তাকে একটা নৌকোয় করে বিল্টনে পাঠিয়ে দিতে। এমন কি ভয় পর্যন্ত দেখালো যে না পাঠিয়ে দিলে সে রীতিমতো মারামারি শুরু করে দেবে।

ক্যাপ্টেন কিন্তু মৃদু হেসে জানালেন যে, গোটা ব্যাপারটা তার নিজের দোষেই ঘটেছে। বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় একটা ছোট্টো নৌকোয় ক'রে সমুদ্রে যাওয়ার তার কী দরকার ছিলো? ওযে ডুবে মরেনি, সেইজন্যে বরং ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। একশো পাউণ্ড দিলেও এখন বিল্টনে ফেরা অসম্ভব জাহাজের পক্ষে।

অবশেষে মার্টিন যখন বুঝতে পারলো, তার বাড়ি-ফেরার

সমস্ত আশাই নিঃশেষিত, তখন সে শান্ত পায়ে নিচে গিয়ে নাবিকদের একটি কামরায় ঢুকে পড়লো। তারপর একটা বার্থে গা এলিয়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলো।

শেষাবধি মার্টিনকে নিশ্চুপে ভাগ্যকে মেনে নিতে হলো। বার্নি ও' ফ্লানগানের নির্দেশ মতো সে কেবিনবয়ের কাজ নিলো জাহাজে। ক্যাপ্টেনও প্রতিশ্রুতি দিলেন মার্টিনকে রীতিমতো মাইনে দেওয়া হবে। মনে মনে যদিও মার্টিন ডরোথি-পিশির কথা ভেবে বিচলিত হয়ে থাকতো, বাইরে কিন্তু সে সেভাব প্রকাশ করতো না।

জাহাজ যখন ব্রেজিলের কাছ দিয়ে চলেছে, তখন সে জাহাজের লোকজনদের মুখে বিপদের আভাস দেখতে পেলো। অবাক হয়ে বার্নিকে সে এর কারণ জিগ্যেস করলে বার্নি জানালো, কিছুকাল ধরে এই এলাকায় বোম্বেটেদের ভয়ানক অত্যাচার শুরু হয়েছে মার্টিন। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে অতর্কিতে বোম্বেটে জাহাজ এসে আক্রমণ করে, তা কেউ বুঝতেও পারে না। সাযুথ আমেরিকার কাছাকাছি এলাকা একবার পেরিয়ে যেতে পারলেই অবশ্য কোনো ভয় নেই। তাই বলে আমাদের ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে—এই আর কি।

এই বলে বার্নি মার্টিনকে সাহস দেবার চেষ্টা করলেও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে মার্টিনের বাকি রইলো না।

সেদিন রাত্রিবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর মার্টিন তার কেবিনে ঘুমোচ্ছে, এমন সময় ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের শব্দে ও সোরগোলে মার্টিনের ঘুম ভেঙে গেলো। হতভম্ব হয়ে মার্টিন তার বার্থের উপর বসে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময় দ্রুত পায়ে বার্নি ঘরে ঢুকে রুদ্ধশ্বাসে বললো, যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো মার্টিন। বোম্বেটেরা আমাদের আক্রমণ করেছে। আর রেহাই নেই। জাহাজের একটা দিক বোম্বেটেদের কামানের গোলায় একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। শীগ্‌গির চলে এসো তুমি। আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে।

সম্বিত ফিরতেই এক লাফে মার্টিন বার্থ থেকে নেমে পড়লো। ডেকে এসে বার্নি চাপা গলায় বললো, সাঁতার কেটে আমাদের পালাতে হবে। তীর এখান থেকে সিকিমাইল মাত্র দূরে। নৌকো করে যাওয়ার চেষ্টা করলে বোম্বেটেরা দেখে ফেলতে পারে আমাদের।

মার্টিন জিগ্যেস করলো, জাহাজের অন্যান্যরা? তাদের কী হবে?

—তারা একটা নৌকায় করে এর মধ্যেই রওনা হয়ে পড়েছে। এসো, আর একটুও দেরি করা চলবে না। একটা কথা মনে রেখো। সব সময়ে আমার কাঁধ আঁকড়ে থাকতে হবে তোমাকে। যদি অন্ধকারে আমরা একবার আলাদা হয়ে পড়ি, তবে আর কিন্তু অচেনা জায়গায় মিলতে পারবো না দুজনে।

—আচ্ছা, উত্তর করলো মার্টিন, একটু আস্তে গেলেই আমি ভালো করে সাঁতার দিতে পারবো।

পরক্ষণেই ডুজনে অন্ধকারে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বোম্বেটেদের হৈ-হল্লা, চিৎকার, বন্দুকের শব্দ তখন চরমে উঠেছে॥

## ॥ গহন অরণ্যের বিভীষিকা ॥

তীরে পৌঁছে বিশাল এক নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের মতো ভিজে দেহ ঝেড়ে বার্নি প্রথমেই তার পিস্তল আর কুঠার অক্ষত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পিস্তলটা এখন যদিও কোনো কাজে লাগবে না, তবে সঙ্গে থাকলে ভালো, কোনোদিন বারুদের সন্ধান পেলে কাজে লাগবে। ভাগ্যিস আবহাওয়া ছিলো উষ্ণ, তাই প্রথমেই দুজনে ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে শুকোবার বন্দোবস্তে তন্ময় হলো। অবশ্য অল্পক্ষণ পরেই যখন দুর্দান্ত দুরন্ত সব মশা এসে একযোগে আক্রমণ করলো, তখন ভালো করে শুকোবার আগেই আবার জামা কাপড় গায়ে চড়াতে হলো ওদের।

ওরা তীরে এসে পৌঁছুবার খানিক পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় উপকূল এবার ওদের চোখের সুমুখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ঢালু বালুময় বেলাভূমি। তার ওধারে ঘাসে-ভরা মাইল খানেক বিস্তৃত সমতল এলাকা। তারপরে গহন অরণ্যের অন্ধকার শরীর। আশেপাশে কোথাও

জনমানবের বসতি দেখা গেলো না। বোধহয় উপকূলে কোথাও জনমানব থাকে না। তবে অরণ্যের ওপাশে জঙলিদের আস্তানা থাকতে পারে।

প্রথমটা ওরা ঠিক করেছিলো অরণ্যের ভিতরেই রাতটা কাটাবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই রাত জাগা পাখিদের ডানা ঝাপ্টানি, নিশাচরদের হিংস্র গর্জন, আর বুনো পশুর দীর্ঘ ডাক ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলো। কী দরকার রাত্রির অন্ধকারে অচেনা অরণ্যে যাওয়ার। তার চেয়ে রাত্রিটা এই সিন্ধুসৈকতে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো।

পিস্তলের সামান্য যে বারুদ ছিলো বার্নির কাছে, কিছু শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে তার সাহায্যে ওরা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু কাঠকুটো ছিলো নেহাৎই অল্প, সারা রাত এতে চলবে বলে মনে হলো না। সুতরাং বার্নি কুঠার হাতে করে অরণ্যের দিকে কাঠের সন্ধানে এগিয়ে গেলো।

অল্পক্ষণ পরে কাঠের বোঝা নিয়ে এসে দুজনে আগুনটা ভালো করে জ্বালিয়ে যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবছে, এমন সময়ে দূরে বজ্রের গর্জন শোনা গেলো। তক্ষুণি বার্নি সচমকে আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে শুরু করে দিলো। অবাক হয়ে মার্টিন শুধালো, কি হলো আবার?

—যা ভয় করেছিলাম। উত্তেজিত গলায় বার্নি বললো, সাংঘাতিক ঝড় আসছে!

—তাতে কী হয়েছে? বললো মার্টিন। ঝড় এলে ঐ ঝোপটায় গিয়ে আশ্রয় নিলেই হবে।

বার্নি ঘাড় নেড়ে বললো, উহু, তাতে হবে না। তুমি তো কখনো এসব অঞ্চলের ঝড়বৃষ্টি দেখোনি, কাজেই বুঝতে পারছো না, কী ভয়ংকর জিনিস এটা। শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চলো। এই বলে পিস্তল আর কুঠার নিয়ে বার্নি অরণ্যের দিকে ছুটতে শুরু করে দিলো। ঝড়বাদল আসছে তো তাতে এতো ভয়ের কি, একথা মার্টিন বুঝতে না পারলেও দ্রুত পায়ে তার অনুসরণ করতে লাগলো।

ওরা যে-মুহূর্তে একটা ঘন ডালপালাওয়ালা গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিলো, সেই মুহূর্তেই ভয়ানক শব্দ করে বাজ পড়লো যেন কোথাও, আর মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুতের হলদে আলোয় আকাশ চিরে গেলো। সন্ত্রস্ত মার্টিন দেখতে পেলো মেঘে-মেঘে আকাশ একেবারে ঝুলকালো হয়ে গেছে। পরক্ষণেই মুশলধারে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো।

সে কী প্রবল বর্ষণ! মার্টিনের মনে হলো পৃথিবীর শেষ যেন উপস্থিত হয়েছে। ওদিকে হাওয়াও চুপ করে বসে নেই। তুমুল ভাবে হাওয়া যেন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো অকস্মাৎ। পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে থাকলো, কাঁপতে থাকলো গাছপালাগুলি। ভীত মার্টিনের মনে হলো এই ঝড়ের হাত থেকে বুঝি আর রেহাই নেই।

কয়েকঘণ্টা ধরে একটানা চললো ঝড়ের উদ্দাম পাগলামো। তারপর যেমন অকস্মাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি অকস্মাৎই ঝড়বাদল থেমে গেলো। নির্মল আকাশে আবার জ্বলজ্বল করতে লাগলো সোনালি তারাগুলি।

ঝড় থেমে যেতেই মার্টিন আর বার্নি আবার সিন্ধু সৈকতে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু ফিরে যাওয়াটা খুব সহজ ছিলো না। যেভাবে ওদের ছুটে এসে অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো এবং ঝড় অরণ্যের মধ্যে যে প্রলয় কাণ্ড করে গিয়েছিলো, তাতে ওরা দিকভুল করে ফেললো, বুঝতেই পারলো না, কোনদিকে বেলাভূমি আছে। যতোই ওরা বন থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে লাগলো, ততোই ওরা অরণ্যের আরো গহনে এসে পড়তে লাগলো। অবশেষে অনেকক্ষণ নিষ্ফলভাবে ঘুরে ওরা ক্লান্ত হয়ে ঠিক করলো, বাকি রাতটা অরণ্যের মধ্যেই কাটাবে। ঐ ঘন অরণ্যের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গা দেখে ওরা একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে শুলো। একটু পরেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

ভোর হলে ব্রেজিলের আশ্চর্য অরণ্যের মধ্যে ঘুম ভাঙলো বার্নি আর মার্টিন র‍্যাটলারের। সকালের স্বচ্ছ রূপালি আলো তখন অপরূপ রঙ ফেলেছে অরণ্যের গাছপালায়। রূপকথার অরণ্যের মতোই অবাক-করা অরণ্য ব্রেজিলের। কতো যে গাছ, আর কতো যে ধরণের—তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। কমলা গাছের পাকা কমলাগুলিতে রোদ পড়ে ঝলমল সোনালি মায়া সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও বা কলাগাছে ঝুলছে পাকা কলার কাঁদি।

নানা ফলমূল দিয়ে অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির শুনতে-শুনতে প্রাতরাশ সাঙ্গ করলো ওরা। খেতে-খেতেই ওরা

ঠিক করতে লাগলো এখন কি করা উচিত। মার্টিন বললো, কাছাকাছি কোথাও জনপদ আছে কি-না খুঁজে দেখতে হবে আমাদের, নিদেন পক্ষে সমুদ্রের তীরে অন্তত পৌঁছানো দরকার। তাহলে হয়তো কোনো জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেবে।

বার্নি বললো, আমারো তাই মত। কোন পথ-ঘাট যখন জানিনে, তখন সুমুখের দিকে এগোনোই ভালো।

—হ্যাঁ, যতোক্ষণ না একটা কিছুর দেখা পাওয়া যায়, ততোক্ষণ সামনের দিকে এগোনোই উচিত, বললো মার্টিন, এবং সেই কারণেই তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়াটাই ভালো।

প্রাতরাশ সেরে দুজনে সামনের দিকে রওনা হয়ে পড়লো। সারাদিন ধরে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে চললো। পথে কতো যে গাছ, কতো যে পাখি, আর কতো যে জন্তু জানোয়ার দেখলো ওরা, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোথাও জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না।

বিকেলবেলার দিকে দুজনে একটা সরু পায়ে-চলার-পথ আবিষ্কার করলো বনের মধ্যে। আর না এগিয়ে সেখানে বসে জিরোবার ব্যবস্থা করলো ওরা। বার্নি কিছু ফলমূল পেড়ে আনলো। সারাদিনে প্রায় তিরিশ মাইল হেঁটেছে ওরা। এখন রীতিমতো পরিশ্রান্ত। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভরে গেছে যেন।

আস্তে-আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এলো। অস্পষ্ট হয়ে এলো অরণ্যের ভিতরটা। দিবাচর পশুপাখিরা আশ্রয় নিতে থাকলো

তাদের বাসায়, ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে এলো চারদিক। তারপর আস্তে-আস্তে ঘুম ভাঙলো নিশাচরদের। মশারা তাদের জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে আক্রমণ করলো ওদের দুজকে। বিপুল বাদুড়দের আনাগোনা শুরু হলো মাথার উপরে, আর শোনা গেলো বানরদের চ্যাঁচামেচি। এমন সময়ে অকস্মাৎ ভয়ংকর এক গর্জন করে ওদের সুমুখে এক মারাত্মক জাগুয়ারের আবির্ভাব ঘটলো।

সন্ধ্যেবেলার অস্পষ্ট আলোয় জাগুয়ারের চোখ দুটী প্রকাণ্ড দুই বিজলি বাতির মতো জ্বলতে থাকলো, আর ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে মার্টিন আর বার্নি লক্ষ্য করলো, জাগুয়ারটা ওদের চেয়ে সামান্য মাত্র দূরে। ভয়ের একটা তুষারশীতল স্রোত এঁকেবেঁকে ওদের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে গেলো মাথায়।

শোনা যায়, বনের কোনো জানোয়ারই নাকি মানুষের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। বিস্ময়ে আর ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে অসহায় মার্টিন আর বার্নি অপলক চোখে জাগুয়ারটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মিনিটখানেক পরেই জাগুয়ারটার চোখের আলো যেন নিভে এলো, ইতস্তত সে দোলালো তার মাথা, তারপর যেন ওদের দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যই ফিরে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর এক গর্জন করে লাফিয়ে অরণ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মার্টিন বললো, ভাগ্যিস জাগুয়ারটা আমাদের আক্রমণ করেনি। করলে আর রেহাই

ছিলো না। শুনেছি, ওদের মতো হিংস্র জানোয়ার নাকি পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

—কথাটা মিথ্যে শোননি। তখনো যেন বার্ণির গলায় একরাশ ভয় জমে আছে। একটিমাত্র কুঠার দিয়ে ঐ জাগুয়ারটাকে কিছুতেই আমরা হত্যা করতে পারতাম না। না, আর এখানে থাকাটা আমাদের ঠিক হবে না। চলো, এই পায়ে-চলার পথ ধরে একটু এগিয়ে দেখি কোথাও জনমানবের চিহ্ন দেখা যায় কি না।

এবার ওরা যে-পথ ধরে এগিয়ে চললো, তা ভয়ানক রকম অসমান বলে ওদের হাঁটতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিলো। তবু ওরা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকলো। শেষটায় যখন একটা ছোটো টিলার চুড়োয় পৌঁছে ওরা রাত্রির মতো জিরোবার বন্দোবস্ত করলো, তখনি ওদের চোখে পড়লো, দূরে সমতল ভূমিতে একটা লাল রঙের আলো জ্বলছে। আলো দেখেই ওদের মনে ভরসা ফিরে এলো। দ্রুত পায়ে টিলা থেকে নেমে ওরা সেই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

রীতিমতো অন্ধকার হয়ে এসেছে এখন। সারা অরণ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে জ্বলছে সবুজ জোনাকি। জোনাকিরা যেন জীবন্ত হিরে, কিম্বা চলমান তারা। মার্টিন তো রীতিমতো অবাক জোনাকিদের উজ্জ্বল আলো দেখে।

আধঘণ্টাখানেক পরে ওরা দুজনে সেই লাল আলোর কাছে এসে পৌঁছুলো। দেখতে পেলো, ছোটো একটা

কুটিরের জানলা দিয়েই ঐ আলো আসছে। পা টিপে-টিপে ওরা দুজনে কুটিরটার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। বার্নি ফিশফিশ করে বললো, সাবধান মার্টিন এর ভিতরে কিন্তু জঙলিরা থাকতে পারে। আর জঙলিরা যে কী-রকম মারাত্মক হতে পারে তা নিশ্চয়ই তোমাকে আর বলে দিতে হবে না।

জানলার কাছে এসে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে ওরা কিন্তু বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো। দেখতে পেলো, একটা কাঠের চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে এক ভদ্রলোক একটি বই পড়ছেন। তাঁর সুমুখে একটা কাঠের টেবিল। সেই টেবিলে আলো জ্বলছে।

আরো একটু এগিয়ে এসে ওরা ভদ্রলোককে ভালো করে দেখতে পেলো। অনেক বয়েস হলেও ভদ্রলোক এখনো পুরোদস্তুর শক্তিশালী। মাথায় তাঁর লম্বা-লম্বা চুল, মুখময় দাঁড়ি-গোঁফ। অলিভের মতো রঙ তাঁর মুখের। বিষণ্ণ এক গাম্ভীর্যে তাঁর মুখ ভরা।

কুটিরটায় একটি মাত্রই ঘর। টেবিল-চেয়ার বাদে আরো দুটি ছোটো টুল আছে সেই ঘরে। ঘরের দেয়ালে অনেক পশুর চামড়া, আর শিকারের সরঞ্জাম। এক কোণে এলোমেলো হয়ে অসংখ্য বই পড়ে আছে। দূর থেকেই অনেকগুলি বইয়ের হলদে চেহারা দেখে তাদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলো।

বার্নি এইসব দেখে এতো অবাক হয়েছিলো যে আচমকা ভদ্রলোক একটু নড়ে বসতেই সে পিছোতে গিয়ে হুড়মুড়

করে একটা ঝোপের উপর পড়ে গেলো। ভদ্রলোকটি ঐ আকস্মিক শব্দ শুনে বিস্মিত হয়েছেন কিংবা ভয় পেয়েছেন কিছুই বোঝা গেলো না। শুধু দেখা গেলো শান্ত ভাবে উঠে দেয়াল থেকে একটা বন্দুক নিয়ে দরজার সামনে এসে পর্তুগীজ ভাষায় সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, কে ?

বার্নি আর মার্টিন পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালো।

ওদের দেখেই এক অদ্ভুত হাসিতে ভদ্রলোকের সারা মুখ ভরে গেলো। পিছিয়ে গিয়ে ওদের আহ্বান করলেন তিনি ভিতরে। বিদেশী উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরিজিতেই বললেন, ভিতরে এসো। তোমরা নিশ্চয়ই ইংরেজ, ভয়ানক খুশি হলাম তোমাদের দেখে। ঈশ ! কতোকাল আগে যে আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, অনেক বছর কেটে গেছে তারপর। ইংলণ্ড থেকে আসার পর এ যাবৎ আর কোনো ইংরেজের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়নি আমার।

এ রকম বহু কথা বলে ভদ্রলোক ওদের নিয়ে টেবিলের সামনে বসালেন। তারপরে কয়েক প্লেট পাকা ও শুকনো ফলমূল, কয়েকটা কেক, চমৎকার মধু, আর এক বোতল ঠাণ্ডা জল ওদের খেতে দিলেন।

পরিশ্রান্ত মার্টিনরা যখন ওদের খাওয়া নিয়ে রীতিমতো তন্ময়, তখন গৃহস্বামী জানতে চাইলেন ওরা কোত্থেকে এসেছে। খেতে-খেতেই বার্নি তাঁকে সমস্ত কথা খুলে

বললো। বোম্বেটেদের আক্রমণের কথা, অরণ্যের বিভীষিকার কথা—কিছুই বাদ দিলো না সে।

গম্ভীরভাবে নীরবে সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, অল্প ক্ষণের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতাই দেখি সঞ্চয় করেছো তোমরা। হয়তো শীগ্‌গিরই আরো অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তোমাদের হবে। তবে এখন তোমরা দুজনে খুব ক্লান্ত, কাজেই তোমাদের বিশ্রাম করা উচিত। আজ রাত্রিটা আমি ভেবে দেখি, কাল আমি সব কথা তোমাদের খুলে বলবো।

ভদ্রলোক একটা দড়ির খাট পাতলেন। খাটটা বেশ বড়োই। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত লম্বা। সেই খাটে দুটি চাদর ছুঁড়ে ফেলে মৃদু হেসে বললেন, এই হলো তোমাদের বিছানা। আশা করি রাত্রে তোমাদের ঘুম ভালোই হবে।

তারপর ভদ্রলোক গিয়ে আবার চেয়ারে বসে সেই অর্ধ পঠিত বইখানা তুলে নিয়ে তার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন।

মার্টিন আর বার্নি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে সেই ঝোলানো খাটে গিয়ে আশ্রয় নিলো। অল্প ক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো দুজনে।

পরদিন সকালে মার্টিনের ঘুম ভাঙতেই সে ভয়ানক দুর্বল বোধ করতে লাগলো। এমন কি, মাথা তুলে বার্নির দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয়ানক ক্লান্তি লাগলো তার। কী ব্যাপার তা কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না।

এমন সময়ে সে দেখতে পেলো গৃহস্বামী একটি বন্দুক হাতে ঘরে ঢুকছেন। টেবিলের উপরে বন্দুকটা রেখে ভদ্রলোক মার্টিনের ঝোলানো বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন। বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, কী সর্বনাশ! এ-অবস্থা কে করলো তোমার?

নিস্তেজ গলায় মার্টিন উত্তর করলো, ঠিক বুঝতে পারছিনে কি হয়েছে। কেবল পায়ের কাছটা কেমন যেন ভিজে-ভিজে ঠেকছে।

চাদর তুলে ভদ্রলোক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রক্তে মার্টিনের পা একেবারে ভেসে গেছে! কয়েক মুহূর্ত পরে পর্তুগীজ ভাষায় কী-সব কথা উচ্চারণ করলেন তিনি যার এক বর্ণও মার্টিন বুঝতে পারলো না।

তার কথা শুনে বার্নির ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। সে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর অস্ফুট গলায় জিগ্যেস করলো, কি ব্যাপার?

ভদ্রলোক উত্তর করলেন, হতভাগ্য ছেলেটা রক্তশোষা বাদুরের পাল্লায় পড়েছিলো—যাকে তোমরা ভ্যাম্পায়ার বলো।

—এঁ্যা? আতঙ্কে বার্নি যেন কুঁকড়ে গেলো একেবারে। কী সর্বনাশ।

—ব্রেজিলের অরণ্যের সবচেয়ে সাংঘাতিক জিনিস এই ভ্যাম্পায়ার। মানুষ আর গরু-ভেড়ার রক্ত শুষে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে এরা। আমার তিন তিনটে গোরু রক্ত শুষে হত্যা করেছে এই ভ্যাম্পায়ারগুলি।

ভয়ে বার্নি অস্ফুটগলায় একেবারে আর্তনাদ করে উঠলো। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে দরজার বাইরে থেকে কি সব গাছের পাতা এনে তার রস মার্টিনের ক্ষত স্থানে মেখে দিলেন। তারপর রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। একটু পরেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলো। তখন ভদ্রলোক ভ্যাম্পায়ারদের মারাত্মক আক্রমণ পদ্ধতির কথা ওদের খুলে বললেন।

ভ্যাম্পায়ারগুলি এতো বড়ো এবং এতো হিংস্র হয় যে রক্ত শুষেই অনেক সময়ে গোরু-ঘোড়াকে একেবারে মেরে ফেলে। অবশ্য একবারে কোনো জন্তুকে তারা হত্যা করতে পারে না, কিন্তু বারবার তারা আক্রমণ করে হতভাগ্য শিকারকে। ক্ষত স্থান থেকে তুমুল রক্তস্রাব হতে থাকে—এতে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্বল হয়ে গিয়ে প্রাণীরা মারা যায়। মানুষকেও তারা কখনো কখনো আক্রমণ করে। সাধারণত পায়ের দিকেই তাদের আক্রমণ ঘটে। এতো সহজ ভাবে নিঃশব্দে তারা রক্ত শুষে চলে যে, ঘুমন্ত প্রাণীরা বুঝতেই পারে না কী ঘটছে।

একটু পরেই সবাই মিলে প্রাতরাশ সেরে নিলো। মার্টিন খুব দুর্বল বোধ করছিলো, সেই জন্যে সে বেশি নড়াচড়া করছিলো না।

খাওয়াদাওয়ার পর বার্নি গৃহস্বামীর দেওয়া পাইপ জ্বালিয়ে বসে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো, আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানতে পারিনি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে,

তবে আপনার নিজের কথা শুনবার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক তাঁর নিজের পাইপে একটা টান দিলেন, তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এবার তবে শোনো।

আপন কথা শুরু করলেন কার্লো।

## ॥ কার্লোর কাহিনী ॥

আঠারোশো আট সালে নেপোলিঅন বোনাপার্টে পর্তুগাল আক্রমণ করলে তৎকালীন পর্তুগিজ সম্রাট ষষ্ঠ জন বাধ্য হয়ে সপারিষদ পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রেজিলে। ব্রেজিলের অধিবাসীরা কিন্তু সাদরে সম্রাটকে স্বাগতম জানিয়েছিলো। সম্রাট ব্রেজিলে আশ্রয় নিয়েই এই অনুন্নত দেশের প্রগতির জন্যে তৎপর হয়ে পড়েছিলেন। দেশের বন্দরগুলি তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সমস্ত জাতির জন্যে উন্মুক্ত করে ফেলা হয়েছিলো। মুছে ফেলা হয়েছিলো ঔপনিবেশিক অধীনত্বের সমস্ত চিহ্ন। অল্প দিনের মধ্যেই কতকগুলি খবর-কাগজ বেরিয়ে পড়লো, স্বীকৃতি দেওয়া হলো বাক-স্বাধীনতাকে। শিক্ষা ও শিল্পের উন্নয়নের জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো।

কিন্তু এতো সব উন্নয়নকার্য চলতে থাকলেও দেশের অভ্যন্তর প্রদেশ কিন্তু যেমনকে তেমনই থেকে গেলো।

পরিকল্পনা মতো প্রগতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখা গেলো না। স্বার্থপর, অশিক্ষিত, অযোগ্য এবং মূর্খ রোম্যান ক্যাথলিক বিশপদের কর্তব্যে অবহেলাই এর জন্যে মারাত্মক রকম দায়ী। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেলো জনসাধারণকে সৎপথে চালিত করার পরিবর্তে তারা অসৎপথের দিকে উন্মুখ করে তুলছে।

ব্রেজিলে প্রথম যে শাদা মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর নাম ছিলো দিয়োগো আলভারেজ কারিয়ো, জঙলিরা তাঁকে ডাকতো কারামারু বা 'আগুনে মানুষ' বলে। যে সব মানুষ ব্রেজিলের প্রগতির প্রতিবন্ধক হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন এই 'আগুনে মানুষেরই' এক উত্তম পুরুষ। পাদ্রি কারামারু কিছুকাল ব্রেজিলের রাজধানী রিয়োডি জেনেরোতে এক ইংরেজ বনিকের সঙ্গে বাস করেছিলেন। পাদ্রি ছিলেন মারাত্মক রকম গোঁড়া। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হোক এটা তিনি কামনা করতেন না। তাই সে কাজে ভয়ানক রকম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নিচু শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার সংস্পর্শে এলে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এই ছিলো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

কিছুকাল পরে জন যখন পর্তুগালে ফিরে গেলেন তখন ব্রেজিলে সাংঘাতিক রকম গোলমাল সুরু হলো, সৃষ্টি হলো বিক্ষোভের। তার কিছুকাল পরেই ব্রেজিলের জনগন তাদের সম্রাট প্রথম ডন পেড্রোর নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেই বিক্ষোভের কালেই পাদ্রি কারামারু তাঁর একমাত্র ভাইকে হারান। ভাইয়ের বয়েস ছিলো নেহাৎই কম। মাত্র কয়েক-

মাস আগে পাদ্রির নির্দেশে সে ফৌজে যোগ দিয়েছিলো। ভাইকে হারিয়ে পাদ্রি কারামারু এতো মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর দেশের বাড়িতে ফিরে এলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই এখন থেকে তিনি শান্তি এবং সান্ত্বনা খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কিন্তু তাতেও যখন ঐ বিপুল শোকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেলো না, তখন গির্জার বিধিনিয়ম এবং বাইবেলের নির্দেশ মিলিয়ে দেখতে শুরু করলেন। যতোই তিনি পড়াশুনো করতে লাগলেন ততোই দেখতে পেলেন বাইবেলের সঙ্গে গির্জের বিধিনিয়ম কিছুই মিলছে না, বরং এর ঠিক বিপরীত কথাই বাইবেলে লেখা আছে।

তিনি বুঝতে পারলেন, যে বিধিনিয়ম ঈশ্বরের বাণী পাঠ করতে জনসাধারণকে নিষেধ করে, কী ঘৃণার্হ তা। তক্ষুণি তিনি তাঁর বিশপত্ব পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিশপত্ব পরিত্যাগ করে তিনি পড়লেন দ্বিধার দোলায়। এবার কী তাঁর কর্তব্য? এমন কারো সাক্ষাৎ তিনি পেলেন না, যাঁর সঙ্গে তিনি এ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। অথচ অলস ভাবে দিন কাটানোও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। কী করবেন বুঝতে না পেরে তিনি যখন দ্বিধার মধ্যে আছেন, তখন একদিন ঠিক করলেন, দেশের অভ্যন্তর অঞ্চলে মালপত্র নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবেন। তাহলেই অবশিষ্ট সময় তিনি বাইবেল পড়ে কাটাতে পারবেন। আরো আলো, আরো সঠিক নির্দেশের সংস্পর্শে তিনি আসতে পারবেন।

এই হলো, কার্লো বললেন, আমার এবং আমার দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। হ্যাঁ, আমিই হলাম পাদ্রি কারামারু কিংবা সিনর কার্লো কারামারু। নিতান্তই একজন সদাগর। এখনো আমি ঠিক করতে পারিনি, কী আমার কর্তব্য হওয়া উচিত। যখন আমি স্বদেশের চারদিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখি যে ঈশ্বরের অমূল্য বাণীকে কী ভাবে লোকেরা অবহেলা করছে, তখন হৃদয় আমার জ্বলতে থাকে। মাঝে-মাঝে মনে হয় ঈশ্বরের বাণী প্রচার করাই আমার কর্তব্য।

কিন্তু, বলে চললেন কার্লো. এখনো আমি যে অনিশ্চিত। আমার এই দ্বিধা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারে, এমন কারো সাক্ষাৎ আমি এখনো পাইনি। তাই ভয় হয়, হয়তো ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে গিয়ে আমি অশুদ্ধ অর্থ করে বসবো তার। আমাকে আরো পড়াশোনা করতে হবে। হয়তো তার পরে আমি ঐ কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবো।

তারপর কার্লো কারামারু ব্রেজিলের ভৌগোলিক বিবরণ বলতে শুরু করলেন। ব্রেজিলের দুর্গম অরণ্য, উদ্দাম আমাজন, জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী—সমস্ত কিছুর কথাই বললেন তিনি। বললেন সোনার খনি, হিরের খনির কথা; বললেন তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা; কিন্তু সব বললেও গানের ধুয়ার মতোই তিনি ফিরে এলেন একটি বিষয়ে। ব্রেজিলের এখন সর্বপ্রধান চাহিদা হলো বাইবেলের, হ্যাঁ, ব্রেজিল এখন চায় এই পবিত্র গ্রন্থের আলোর স্পর্শ. এইটেই তার একমাত্র

বাসনা। যে সব জংলি আছে ব্রেজিলে, যারা হিংস্র, নরখাদক, উলঙ্গ, তাদের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে ঈশ্বরের অমূল্য বাণী, তাদের সভ্য করে তুলতে হবে, শিক্ষিত করে তুলতে হবে ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রীষ্টের অমূল্য উপদেশে।

কথা বলতে-বলতে সিনর কার্লো কারামারুর গলা আবেগে ভারি হয়ে আসে, আর অবাক হয়ে সেই সব কথা শুনতে থাকে বার্নি ও' ফ্লানাগান ও মার্টিন র‍্যাটলার।

## ।। অনেক বিস্ময় ।।

পাদ্রি কার্লোর জঙ্গলবাড়িতে মার্টিন র‍্যাটলার আর বার্নি ও' ফ্লানাগানের দিনগুলো ভালোই কেটে চললো। বেশ কয়েক সপ্তাহই ওখানে কাটালো দুজনে। প্রত্যেক দিন শিকারে গিয়ে নানান ধরণের জীবজন্তু শিকার করে আনতো বলে খাবারদাবারেরও কোনো কষ্ট ছিলো না। এছাড়া, শাকসব্জি ফলমূলের তো অভাবই নেই ব্রেজিলের অরণ্যে।

একদিন অন্যদিনের চেয়ে আগেই ঘুম থেকে উঠলেন সিনর কার্লো। মার্টিন আর বার্নিকেও ডেকে তুললেন। আজ একটু বেশি দূরে শিকারে বেরোতে হবে। সুতরাং রোদ প্রখর হয়ে উঠবার আগেই গন্তব্য স্থলে পৌছনো দরকার।

শিকারে বেরোতে হলেই সিনর কার্লো ধারালো একটা ছুরি, একটা পিস্তল এবং একটি দু'নলা বন্দুক সঙ্গে নিতেন। বার্নিকে তিনি একটি শিকারের ছুরি উপহার দিয়েছিলেন।

এছাড়া নিজের গুলি-বারুদও তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দিতেন। কিন্তু মার্টিনের কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র ছিলো না বলে সিনর কার্লো তাকে একটা ধনুক তৈরি করে দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন একরাশ তীর। কয়েকদিন অভ্যেস করার পর মার্টিন তো ধনুক-বান ব্যবহারে রীতিমতো ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলো।

সেদিন সকাল বেলায় যথারীতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওরা জঙ্গলকুটির থেকে বেরিয়ে সরাসরি গহন অরণ্যে এসে প্রবেশ করলো। সিনর কার্লো চলতে-চলতে বললেন, আজকে পথে জাগুয়ারের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা আছে, কাজেই তোমরা সাবধান থেকো। কাল আমি একটা জাগুয়ারকে ওদিকপানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। অরণ্যপথ ধরে যেতে-যেতে সিনর কার্লো ওদের এক অদ্ভুত ধরণের বিপুল আকারের পাখি দেখালেন। পাখিটার নাম আর্মাভিলো। আর্মাভিলোদের কতকগুলি অদ্ভুত অভ্যেস্যের কথাও ওদের জানালেন সিনর কার্লো এবং সব শেষে মন্তব্য করলেন, এই পাখির মাংস খেতে খুব ভালো।

পথে খানিকক্ষণ জিরোবার পরে ওরা এবার ঘন অরণ্যে প্রবেশ করলো। এতোক্ষণ ওরা বেশ সহজেই হাটতে পারছিলো, কিন্তু ডালপালা ঝোপঝাড় সরিয়ে একটু চলবার পরেই কিন্তু ওরা একটা খোলা জায়গায় এসে পৌছালো। সেই খোলা জায়গায় বিপুল আকারের কয়েকটা সরল গাছ সোজা শূন্যে মাথা তুলেছে।

ঐ গাছগুলি দেখিয়ে সিনর কার্লো বললেন, এরাই হলো আমার গোরু। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো, এদের দেখাশোনা বা তদ্বির করবার কোনো হাঙ্গামা আমাকে পোয়াতে হয় না। যে-কোনো সময়েই এরা দুধ দিতে প্রস্তুত।

এই কথা বলে তিনি কুঠার দিয়ে গাছের গায়ে সজোরে আঘাত করলেন। অমনি মার্টিন আর বার্নি সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, সেই কাটা জায়গা থেকে ঘন শাদা এক ধরণের তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো অঝোর ধারায়।

সিনর কার্লো সঙ্গে একটা জলের বোতল নিয়ে এসেছিলেন। ঐ তরল পদার্থে সেই বোতলটা ভরে তিনি ওদের খেতে দিলেন। খেয়ে অবাক গলায় মার্টিনরা জানালো, সত্যিই, আশ্চর্য ভালো তো খেতে!

মাসেরানডুবা বা দুধের গাছ হলো ব্রেজিলের অরণ্যের অন্যতম বিস্ময়। বিরাট উঁচু হয় গাছগুলি, সোজা ঋজুভাবে মাথা তোলে আকাশে। আর এর ফলগুলি দেখতে হয় ছোটো আপেলের মতো, খেতে খুব সুস্বাদু। এই গাছের কাঠও খুব শক্ত। কিন্তু এর সব চেয়ে আশ্চর্য গুণ হলো, এর কাটা জায়গা থেকে অঝোরধারে বেরিয়ে-আসা দুধের স্রোত। গোরুর দুধের মতোই খেতে, তবে একটা বুনোটে গন্ধ আছে, কিন্তু সেই গন্ধটাও বেশ ভালো লাগে। চায়ে কিংবা কফিতে দিলে গোরুর দুধেরই কাজ করে এ।

দুগ্ধপর্ব শেষ করে তিনজনে আবার চলতে থাকলো। খানিকক্ষণ পরেই সবাই এক টিলার সামনে এসে উপস্থিত

হলো। টিলার আশেপাশেও কিন্তু অরণ্য তেমনি ঘন। টিলার গায়ে ইতস্তত অনেক অন্ধকার গহ্বর। সিনর কার্লো বন্দুক হাতে এগোতে-এগোতে বললেন, শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও। আশংকা করছি, শ্রীযুক্ত জাগুয়ার কাছাকাছিই আছেন। গতকাল আমি শ্রীযুক্তকে দেখেছি, এবং কোনোরকম দুষ্কর্ম না করে যে তিনি প্রস্থান করবেন, একথা আমার মনে হয় না।

ঠিক এমন সময়েই একটা গহ্বরের ভিতর থেকে অদ্ভুত ধরণের একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এলো, দূরবজ্রের মতো সেই আওয়াজ। তক্ষুনি সিনর কার্লো সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ফিশফিশ করে বললেন, মার্টিন, শীগ্‌গির গহ্বরটার মধ্যে একটা তীর ছোঁড়ো।

মার্টিন দ্বিরুক্তি না করে তাঁর কথা তক্ষুনি পালন করলো। তীরটা গহ্বরের ভিতরে অদৃশ্য হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটি বিকট বন্য গর্জনে চারদিক থরথর করে কেঁপে উঠলো। সিনর কার্লো ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর মতো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরক্ষণেই আবার এক তীক্ষ্ণ গর্জনে চারদিক ছেয়ে গেলো, আর ঝোপঝাড় হুড়মুড় করে কাঁপিয়ে বিশাল এক জাগুয়ার কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এলো গহ্বর থেকে। সিনর কার্লো কিন্তু একটুও নড়লেন না। তাঁর কুঠারের চকচকে ফলা তীব্র বেগে জাগুয়ারের বুকে গিয়ে পড়লো। কিন্তু জাগুয়ারটা তার বিপুল দেহ নিয়ে, বুকে বিদ্ধ কুঠার সমেত, লাফিয়ে পড়লো সিনরের উপরে। সেই মুহূর্তে বার্নি তার পিস্তল ছুঁড়লো জাগুয়ারকে লক্ষ্য করে। তাতে কিন্তু জাগুয়ারটার কিছু হ'লো

বলে মনে হ'লো না। সিনর কার্লোর হাত থেকে ছিটকে-পড়া বন্দুকটা তুলে মার্টিন চোখের পলকে জাগুয়ারের দিকে ছুটে গেলো। তারপর জাগুয়ারের কানে বন্দুক ছুঁইয়ে নিমেষের মধ্যে গুলি করলো। জাগুয়ারটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে চারদিক কাঁপিয়ে তুলেই সিনর কার্লোর পাশে নিস্পন্দ পাথরের মতো আছড়ে পড়লো।

## ॥ আমাজনের স্রোতের উপর ॥

এই ঘটনার কিছুকাল পর থেকেই মার্টিন র‍্যাটলার আর বার্নি ও' ফ্ল্যানাগানের মনে ব্রেজিলের গভীর অরণ্যে পর্যটনের স্পৃহা জাগলো। মার্টিন তো বিশেষ করে মহানদী আমাজন দেখবার জন্যে রীতিমতো উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ওদিকে বার্নি তো হিরের খনি দেখবার জন্যে রীতিমতো পাগল হয়ে উঠলো। রাশি-রাশি হিরের চোখ ঝলসানো আলো যেন স্বপ্নেই তার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে শুরু করলো।

একদিন মার্টিন সিনর কার্লোকে তাদের বাসনার কথা খুলে বললো। সিনর কার্লো সহজেই রাজি হলেন, বললেন, ওদের সঙ্গে করেই তিনি একদিন অরণ্যের গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করবেন'খন। তারপর অবশ্য তাঁকে অল্পক্ষণ পরেই ফিরে আসতে হবে এই জঙ্গলি বাড়িতে।

মার্টিন তো একথা শুনে আনন্দে একেবারে আত্মহারা। সিনর কার্লো আরো জানালেন যে আমাজনে ক্যানো-চালক

হিসেবে সহজেই ওরা চাকরি পেতে পারে, কারণ ঐ নদীতে ক্যানো চালাতে অনেকেই সাহস পায় না, এবং ওরা যদি উত্তাপ সহ্য করে রেড-ইণ্ডিয়ানদের মতো কর্মক্ষম হতে পারে তবে যতো ইচ্ছে ততো ওরা ব্রেজিলের অরণ্যে ভ্রমণ করতে পারবে।

মার্টিন আর বার্নি দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলো, উত্তাপ সহ্য করাটা আর বেশি কথা কি। ও আমরা অনায়াসেই পারবো।

কাজের বেলায় অবশ্য পরে দুজনেরই পরিত্রাহি বলে চ্যাঁচাতে হয়েছিলো। কিন্তু সে তো পরের কথা।

তিন সপ্তাহ পরে ওরা মাইল-কুড়ি দূরের এক জনপদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লো। সেখান থেকে শুরু হলো ওদের অরণ্যযাত্রা। আমাজনের শাখাবিধৌত ব্রেজিলের নিম্নভূমি দিয়েই ওরা প্রথমটা চলতে থাকলো।

*　　　*　　　*

কয়েক মাস পরে মার্টিন র‍্যাটলার আর বার্নি ও' ফ্ল্যানাগানকে আমাজনের স্রোতের উপর একটা ক্যানোয় দেখা গেলো। সিনর কার্লো ওদের সঙ্গে আমাজনের এক শাখানদী পর্যন্ত এসেছিলেন। সেখানে তাঁর পরিচিত এক মুলাটো বণিকের কাছে বলে কয়ে ওদের দুজনের জন্যে একটা ক্যানোর ব্যবস্থা করে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

সেদিন বার্নি আর মার্টিন মুলাটো-বনিকের সঙ্গে ক্যানো নিয়ে আমাজনের এক শাখানদীর মধ্যে প্রবেশ করেছে,

উদ্দেশ্য কাছিমের ডিম সংগ্রহ। তীরের বালুভূমিতে কাছিমেরা ডিম পেড়ে রাখে। সেগুলো সংগ্রহ করলে বেশ কয়েকদিনের জন্যে আহার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যেখানে শাখা-নদীটা অকস্মাৎ সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে মোড় ঘুরেছে, সেই জায়গায় তীরে বেশ ঘন ঝোপঝাড়। ওরা দেখতে পেলো, তীরের একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা একটা ক্যানো সেখানে পড়ে আছে। আর তার উপরে গাছের দুই শাখায় বাঁধা একটা ঝোলানো খাট। সেখানে এক বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ান সম্পূর্ণ নগ্নদেহে পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। দেখে মার্টিনের ভারি হাসি পেয়ে গেলো, সে তক্ষুণি 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিশি' গাইতে শুরু করে দিলো।

বার্নি বললো, আর যদি দু'ফুট নিচে ঝোলানো-খাটে লোকটা ঘুমোতো, তবে নির্ঘাৎ কুমীররা আজ মহানন্দে ভোজে বসতে পারতো।

ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দাঁড়ের একটা খোঁচা দিয়ে যাবো, হেসে বললো মার্টিন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বার্নি অকস্মাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে-বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো !!

বার্নি কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে সাপ এতো বড়ো হতে পারে। ষোলো ফুট লম্বা সাপটা চওড়ায় একটা জোয়ান লোকের সমান। আর তার মাথার কাছটা বোধ হয় তিনটে মোটাসোটা লোকের মতো। সাপটা অবশ্য সব চেয়ে বড়ো নয়। দক্ষিণ-আমেরিকায় চল্লিশ ফুট লম্বা সাপ পর্যন্ত আছে।

কিন্তু মার্টিন আর বার্নির মনে হলো ওরা স্বপ্ন দেখছে। সাপ কখনো কি এতো বড়ো হয়?

মুলাটো-বণিকের দিকে ফিরে বড়ো-বড়ো চোখে মার্টিন বললো, এটা নিশ্চয়ই একটা অ্যানাকোণ্ডা। নয় কি?

—হ্যাঁ, ঘাড় নেড়ে মুলাটো-বণিক জানালো। কিন্তু মারা গেছে।

—তাইতো! কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠলো মার্টিন। গ্রীবার কাছে সর্পদানব দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে।

—কী আশ্চর্য! বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো বার্নি। একথা কে কবে ভেবেছিলো যে সাপের শরীরে ষাঁড়ের শিঙ গজায়! মার্টিন তাড়াতাড়ি তীরে নামলো। বললো, শ্রীমান আনাকোণ্ডার চামড়াটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখবো আমি।

তৎক্ষণাৎ ক্যানো তীরে ভিড়লো। পরক্ষণেই ওরা তিনজনে সেই বিপুল সর্পদানবের চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর চামড়া ছাড়াতে-ছাড়াতে মার্টিন আর বার্নি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো ষাঁড়ের শিঙের ঘায়েই সর্পদানবটি দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে। একটা গোটা ষাঁড় আহার করছিলো সাপটা মৃত্যুর আগে। কী সাংঘাতিক।

মুলাটো-বণিক ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানালো, এতো সামান্য ব্যাপার, আনাকোণ্ডা সাপেরা প্রায়ই গোটা একটা ঘোড়া কিংবা ষাঁড় গিলে ফেলে, ওটা ওদের স্বভাব।

সাপের চামড়াটা ছাড়ানো হলে পর মার্টিন আর মুলাটো-বণিক ক্যানোয় ফিরে এলো। বার্নিও তখন ফিরবে-ফিরবে

করছে, এমন সময়ে তার পিছনের ঝোপটা ভয়ানক রকম দুলে উঠলো। বিদ্যুতের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্নি সভয়ে দেখতে পেলো, মৃত অ্যানাকোণ্ডাটির মতোই বড়ো আরেকটি সর্পদানব তার উপর লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে—অন্ততঃ বার্নির মনে হলো লাফিয়ে পড়বেই। চক্ষের নিমেষে শূন্যে উঠে গেলো বার্নি, তারপর সজোরে এসে নামলো ক্যানোয়। এতো জোরে এসে নামলো যে ক্যানোটা রীতিমতো উল্টে পড়ে যাবার উপক্রম! ক্যানোতে পৌঁছেই এক ধাক্কায় সে ক্যানোটাকে মধ্য নদীতে নিয়ে এলো।

মধ্য নদীতে পৌঁছে ওরা ফিরে তাকালো ঝোপটার দিকে। কিন্তু না, সর্পদানবের কোনো পাত্তাই নেই তখন।

এর অল্প খানিকক্ষণ পরেই ওরা বিপুল এক বালুময় নদীতীরে এসে পৌঁছুলো। বুড়ো মুলাটো বললো, এখানে যতো ইচ্ছে কাছিমের ডিম পাওয়া যাবে।

মার্টিন আর বার্নি কিন্তু খুব ভালো করে তাকিয়েও কোনোদিকে কিছু দেখতে পেলো না। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন বুড়ো-মুলাটো তার অভ্যস্ত হাতে বালুরাশির মধ্য থেকে প্রায় একশোটি ডিম বের করে আনলো, মার্টিন আর বার্নি সন্তুষ্ট বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হতভম্ভ হয়ে থাকলো।

একটু পরেই বার্নি উঁচুদরের খানশামার মতো ওগুলোর সদ্ব্যবহার করলো। বেশ ভালোই রান্না করতে পারে সে। তারপর তিনজনে মিলে প্রচুর পরিমাণে সেই সব আহার্য উদরে প্রেরণ করে পরম আয়েসে উদ্গার তুলতে শুরু করে দিলো।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই আমাজনে ক্যানো চালাতে হচ্ছে ওদের। কিন্তু এরকম পরিতৃপ্তিতে বহুকাল আহার করার সৌভাগ্য হয় নি।

কয়েকদিন পরে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মার্টিন, বার্নি আর সেই মুলাটো-বণিককে তাদের ছোট্টো ক্যানোটায় দেখা গেলো। মৃদু হাওয়ায় তখন তরতর করে এগিয়ে চলেছে ক্যানো। জঙ্গলের মধ্যে যেন খুব চট করে রাত হয়ে যায়। এখানেও তাই দেখতে-দেখতে রাত হয়ে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে থাকলো। এমন সময় অকস্মাৎ হাওয়া থেমে গেলো, যেন মৃত্যুর মতো শান্ত হয়ে গেলো হঠাৎ। ক্যানো চালানো তখন বেশ কঠিন হয়ে উঠলো ওদের পক্ষে। ওরা ঠিক করলো এখানেই তীরে ক্যানো ভিড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

ক্যানো তীরে ভিড়িয়ে চারদিকে কোথাও ওরা জনমানবের বসতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেলো না। শক্ত, কঠিন তীরভূমি। তখনো আগুনের হল্কার মতো উত্তপ্ত। সারাদিন যা গরম গেছে!

চারদিকে তাকিয়ে মার্টিন বললো, উঁহু, বার্নি, জায়গাটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। কী-রকম যেন লাগছে। আরে! ওকি! ঐ যে একটা ছোটো কুটিরের মতো দেখা যাচ্ছে! গাছতলায় রাত কাটানোর চেয়ে কুটিরটা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভালো হবে!

বলতে-বলতে মার্টিন একটা ছোটো কুটিরের দিকে তর্জনী সংকেত করলো। এই ধরণের এক-একটা ছোটো কুটির আমাজনের তীরে ব্রেজিলের জঙ্গলে প্রায়ই দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এখানকার অধিবাসীরা প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করে। বর্ষার সময়ে জল বেড়ে গেলে ওগুলো আর ব্যবহার করা যায় না। তখন তারা ওগুলো পরিত্যাগ করে চলে যায়।

মার্টিন যে কুটিরটার দিকে তর্জনী সংকেত করেছিলো, সেইটাকে দেখেই বোঝা গেলো, সেটা বহু দিনের পুরনো। মেঝে তো রীতিমতো বিধ্বস্ত বলতে গেলে। পামগাছের পাতার ছাউনিও তেমন সুবিধের বোধ হোলো না। তবু নাই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভালো। কাজেই ঝোলানো খাট টাঙিয়ে ওরা মেঝের একদিকে আগুন জ্বেলে, রাত্রির আহার তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওরা যখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, তখন আকাশ মেঘে একেবারে কালো হয়ে গেছে। মুলাটো-বণিক আকাশের চেহারা দেখে একটু ভয় পেয়েছে বোঝা গেলো। মার্টিনরা বুঝতে পারলো, ঝড়বাদলের দিন প্রত্যাসন্ন, এই আশংকাই করছে সে।

ওরা যখন ঝোলানো বিছানায় আশ্রয় নিলো, তখন তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ছাদ দিয়ে সেই বৃষ্টির প্রবল আনাগোনা এমনভাবে চলতে থাকলো যে ওদের সর্বশরীর একেবারে ভিজে গেলো। আর ভিজলো ঘরের মেঝে। আর সেইক্ষণে প্রবলভাবে কুটিরটা গুমগুম শব্দ করে কেঁপে উঠলো। পরক্ষণেই কুটিরের সেই বিধ্বস্ত মেঝের এক জায়গার মাটি চারদিকে ছড়িয়ে

পড়লো, আর মাটির নিচ থেকে বিশাল এক আবলুশ রঙের ঝুলকালো কুমীরের অভ্যুদয় হলো। তারপর প্রবলভাবে কুটির কাঁপিয়ে সেই জলদানব খোলা দুয়ার দিয়ে রাত্রির বর্ষণগভীর অন্ধকারে বেরিয়ে গেলো !

এই আশ্চর্য কাণ্ডের তিন জন দর্শকই তখন স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক। বার্নি শুধু গোলগোল চোখে মেঝের গর্তটার দিকে তাকিয়ে রইলো, যে গর্তটা থেকে এইমাত্র আবির্ভাব হলো ঐ জলদানবের। চার সপ্তাহ আগে যখন কুটিরের মেঝে নরম কাদায় আচ্ছন্ন ছিলো, তখন এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলো ঐ কুমীর। ওদের স্বভাবই হলো সুযোগ পেলে গ্রীষ্মকালে শুকনো মাটিতে আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু আবার যখন বর্ষাকাল আসে, যখন প্রথম বর্ষণের বৃষ্টিবিন্দু মাটি ছোঁয়, তখন আবার তাদের সহজাত প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, জেগে ওঠে জলকেলির বাসনা, এবং তখন মাটির কারাগার চুরমার করে তারা আবার নদীর জলে নেমে যায়।

বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগেই বার্নিদের সামনে আরেকটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিলো। বৃষ্টি তখন পড়ছে রীতিমতো মুষলধারে। পাতার ছাউনির কথা আর কহতব্য নয়। ওরা বাধ্য হয়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। কিন্তু প্রবল বর্ষা ওদের ক্ষান্তি দিলো না। আকাশে কে যেন এক বিরাট পিপে উপুর করে রেখেছে, বৃষ্টির তোড় এমন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠলো, ভাসিয়ে দিলো কুটিরের মেঝে, আর ওরা বাধ্য হয়ে জলের সমতলের সামান্য উপরে ঝোলানো খাটে আশ্রয় নিয়ে ভিজে চললো।

## ॥ নিয়তির ডাক ॥

আমাজনের একটা বিদঘুটে স্বভাব আছে। বর্ষাকালে তার জল ফুলে, ফেঁপে উঠে রীতিমতো প্রলয়কাণ্ডের সূচনা করে। যেখানে তার তীর ঢালু সেখানে স্ফীত জলস্রোত ডাঙাকে ভাসিয়ে বন্যার মতো বয়ে চলে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ওরা আমাজনের বদস্বভাব ভালো ভাবেই বুঝতে পারলেও সঠিক যে বুঝতে পারছিলো তা মনে হয় না। কেননা, পরদিন সকালেই ওদের ইচ্ছে হলো ক্যানো চালিয়ে ব্রেজিলের আরো অভ্যন্তরে, আমাজনের আরো গহীনে প্রবেশ করে। ওদের মানে মার্টিন আর বার্নির। বুড়ো-মুলাটো কিন্তু ওদের ঐ ইচ্ছেকে মোটেই আমোল দিলো না। কারণ ভয়ংকর আমাজনকে সে চেনে। সে ওদের সঙ্গে নিয়ে একটা ছোটো গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলো। ঠিক করলো, বর্ষাকালটা ঐ গ্রামেই কাটাবে।

এভাবে নিষ্কর্ম বসে-থাকাটা কিন্তু মার্টিন আর বার্নি দুজনেরই প্রবল অপছন্দ ছিলো। মার্টিন এর মধ্যেই ব্রেজিলের অরণ্যকে ভালোবেসে ফেলেছে, তার ইচ্ছে গহন ব্রেজিলকে ভালো করে দেখে। আর বার্নি তো হিরের খনি দেখবার জন্যে প্রথম থেকেই রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো।

তাই এই গোটা বর্ষাকালটা এমন অলসের মতো বসে-বসে কাটানোটা ওদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো।

সমস্ত কিছুরই একদিন অবসান হয়। বর্ষারও হলো। ঝড়বাদলের দিন অপগত হতেই আবার ওরা তিনজনে ক্যানোয় করে রওনা হয়ে পড়লো। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পরিশ্রান্ত শরীরে ওরা রাত্রির জন্যে যেখানে ক্যানো ভিড়ালো, সে জায়গাটায় তীরের কাছটা ঠিক যেন পাথুরে টিলার মতো। জলের গর্ভ থেকে পাথুরে তীর মাথা তুলেছে যেন শূন্যে। সকালবেলা থেকেই সেদিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা ক্যানো চালিয়ে। তাই সন্ধ্যেবেলায় শরীর ওদের খুব ক্লান্ত। তীরে ক্যানো ভিড়িয়েই ওরা আগুন জ্বালিয়ে রাত্রির তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সুন্দর শান্ত সন্ধ্যা। মশাদের প্রাদুর্ভাবও বলতে গেলে নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে আগুনের ধারে তিনজনে আয়েস করে বসে গল্প করতে শুরু করে দিলো। বার্নি তার পাইপ জ্বালিয়ে একটু হেলে বসলো পরম তৃপ্তিতে।

চারদিকে ঝুলকালো অন্ধকার। একরকমের ফ্যাকাশে আলোয় সারা আকাশ ভরা। সেই ফ্যাকাশে আকাশে ভিড় করে আছে অসংখ্য জ্বলন্ত তারা। সেই তারার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে কে যেন এঁকে দিয়েছে শাদা একটি ছায়াপথ। ধবল তার রঙ, তারাদের সোনালি আলোয় ঝিকমিক করছে জোনাকির মতো।

মার্টিনদের তাঁবুর আঙিনা তাদের জ্বালানো আগুনের কুণ্ডের আভায় বেশ উজ্জ্বল। অকস্মাৎ মার্টিন বাইরে অরণ্যের

একদিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে উঠলো। অবাক গলায় বললো, দ্যাখো দ্যাখো বার্নি, একটা লাল-মানুষ! কী কুৎসিত দেখতে।

তারপর বুড়ো মুলাটোর দিকে ফিরে বললো, ঐ লাল-মানুষদের জাতের নাম কি জানো? জংলি বলে মনে হচ্ছে আমার।

লাল-মানুষটার দিকে তাকিয়ে কাগজের মতো শাদা হয়ে এলো মুলাটোর মুখ। অস্বচ্ছন্দ গলায় বললো, ঠিক বুঝতে পারছি নে কোন্ জাতের লোক।

লাল-মানুষটা এতোক্ষণ অপলকে ওদের দেখছিলো। এবার সে অকস্মাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের ভিতর থেকে ঠিক সেই রকম বিকট চিৎকার শোনা গেলো। তারপরেই দেখা গেলো, অরণ্যের মধ্য থেকে ভূতের মতো পঁচিশ ত্রিশটি লাল-মানুষ বেরিয়ে এলো। প্রত্যেকেরই দেহে স্বল্পতম আবরণ। তাও পশুচামড়ার ও লতাপাতার। বলতে গেলে উলঙ্গই। সারা গায়ে বিদঘুটে উল্কি আঁকা তাদের। কিছুক্ষণ তারা স্থির চোখে ওদের লক্ষ্য করে যেমন আচমকা বন থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, তেমনি আচমকা বনের ভিতর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

এতোক্ষণ বার্নিরা হতবাক হয়ে লাল-মানুষদের রকম-সকম দেখছিলো। এবার ওরা অদৃশ্য হতেই বার্নি হাঁফ ছেড়ে বললো, যাক, বাঁচা গেলো। আমি তো ভেবেছিলাম ওরা বুঝি সত্যি-সত্যিই মানুষ-খেকো জঙলি লোক।

—ওরা যে মানুষ-খেকো জঙলি নয়, জিগ্যেস করলো মার্টিন, তা তুমি বুঝলে কি করে ?

—তাই যদি হতো তবে তো আমাদের আক্রমণই করতো, উত্তর করলো বার্নি। ওরা মোট পঁচিশ ত্রিশজন ছিলো, আর আমরা মাত্র তিনজন। অনায়াসেই ওরা আমাদের আক্রমণ করতে.পারতো।

—হয়তো সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিলো না বলেই আক্রমণ করেনি, পরে হয়তো গভীর রাতে অতর্কিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে আক্রমণ করবে। কাজেই আমি বলি কি, এখন আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ি, বললো মার্টিন।

বার্নি বুড়ো-মুলাটোকে শুধোলো, তুমি কী বলো ? গতিক সুবিধের বলে মনে হচ্ছে কি ?

বুড়ো-মুলাটো কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। উৎকর্ণ হয়ে সে কী যেন শুনবার চেষ্টা করতে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তার এই ভয় কিসের জন্যে ? এই কথাটা মার্টিন জিগ্যেস করতে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে গেলো। অদ্ভুত একটা শব্দ তারও কানে এসে পৌঁচেছে। না, জাগুয়ারের গর্জন নয়. কিংবা কোনো বুনো জানোয়ারের ডাকও নয় ! অরণ্যের কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে আকাশের বুক কাঁপিয়ে অস্ফুট একটা ভয়ের স্পন্দন যেন উঠছে—দ্রিম-দ্রিম দ্রিম !

একদিকে সে শব্দ শেষ না হতেই আরেক দিকে সে শব্দের অবিকল প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেলো। সেই প্রতিধ্বনি

তারপরেই অন্য আরেক দিকপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো। এমনি করে সে শব্দ আকাশের এক কোণ থেকে আরেক কোণে কোন অদৃশ্য বিরাট দানব যেন লোফালুফি করছে মনে হলো।

ভালো করে খানিকক্ষণ শব্দটা শুনেও মার্টিন কিছুই বুঝতে পারলো না, শুধু দেখতে পেলো বুড়ো-মুলাটোর মুখটা কাগজের মতো শাদা হয়ে উঠেছে। সভয়ে সে বললো, সর্বনাশ হলো! ঢাকের আওয়াজ বলছে, দেবতার দুশমন শয়তানকে চাই! কোনো পাহাড়-জঙ্গল তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না! আগুনের চুল্লি তৈরি!

ঐ শব্দের অল্পবিস্তর মানে বুঝে মার্টিনের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে এলো। বার্নি তো একেবারে পাথরের স্ট্যাচুর মতো রক্তহীন।

ব্রেজিলের জঙ্গলের সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয় আছে, এ-শব্দের অসামান্য ক্ষমতা ও ভয়ংকর মর্ম তারা ভালো করেই কিছু না কিছু জানে। এ-শব্দ ব্রেজিলেরই অত্যাশ্চর্য নিজস্ব জিনিস। আসলে বিশেষ একধরণের ঢাকের শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে-দেশের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দশ মাইল দূরের গাঁয়ের লোকেরা পরস্পরের ধারে-কাছে ঘেঁষে না, পরস্পরের ভাষা বোঝে না, সেই দেশে এই ঢাকের শব্দের মারফত টেলিগ্রাফের মতো তাড়াতাড়ি শত শত মাইল দূর-দূরান্তরে খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এ-ঢাকের শব্দের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন ভাষার লোকেরা

এই ঢাকের ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারে। এ-ঢাকের আওয়াজ বিলি করবার ব্যবস্থাও অদ্ভুত। এক গাঁ থেকে ঢাকের শব্দ শোনামাত্র অন্য গাঁ তৎক্ষণাৎ সে-খবর ঢাকের আওয়াজে প্রচার করে দেয়। এমনি করে দেখতে-দেখতে সে-খবর বহুদূরে ছড়িয়ে যায়। কারুর বিরুদ্ধে এ-ঢাক যদি একবার বেজে উঠে, তা-হ'লে যতো দূরে পালাক, এ-ঢাকের নাগাল থেকে পরিত্রাণ পাবার আশা তার নেই।

ঢাকের আওয়াজটা কিন্তু ধীরে ধীরে চারদিকে ঘেরাও করে এই দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। এখন এর বেড়াজাল থেকে পালাবার আর কোনো উপায় এই দুর্গম অরণ্যে নেই। ভয়ে, বিস্ময়ে ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো বিমূঢ়ের মতো। আর এমন সময়ে সমস্ত পাহাড় জঙ্গল যেন এক সঙ্গে বজ্রের হুংকার দিয়ে উঠলো। সচমকে দেখা গেলো, রঙবেরঙের বিদঘুটে উল্কি-আঁকা অজস্র জংলি ঢাক আর বল্লম হাতে যেন ভোজবাজিতে মাটি ফুঁড়ে উঠে ওদের ঘিরে ধরেছে।

জংলিরা মার্টিন আর বার্নিকে খুব ভালো করে বাঁধলো; কিন্তু মুলাটো-বণিককে স্পর্শও করলো না। তাই বলে মুলাটো-বণিককে ছেড়েও দিলো না, ওদের আশপাশে পাহারায় রইলো কয়েকজন। আর, আশ্চর্যের ব্যাপার. ঐ পাহারাদারদের কাছে তীর রয়েছে কিন্তু ধনুক নেই। বল্লমের মতো লম্বা বাঁকা তীর দেখা গেলো, কিন্তু তাও সুঁচোলো নয়, বা তাতে ইস্পাতের কোনো ফালি লাগানো নেই।

অবাক হয়ে বার্নিরা এই অস্ত্র-শস্ত্রের ধরণ বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলো না প্রথমে। অবশ্য একটু পরে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে এলো। তেরো ফুট লম্বা ঐ বাঁশের শেষের দিকের ফুটোয় একটা তীর ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্তটা মুখে দিলো একটা জংলি। তার পরমুহূর্তেই দেখা গেলো তীরটা বিদ্যুৎ-দ্রুত-গতিতে ছুটে গিয়ে গাছের ডালে বসে থাকা একটা পাখিকে বিদ্ধ করলো।

বার্নি চেঁচিয়ে উঠলো, বুঝতে পেরেছি, এটা ব্লো-পাইপ। এতোক্ষণে উজ্জ্বল ইস্পাতের শলাকার রহস্য বোঝা গেলো।

মার্টিন বিস্মিত স্বরে বললো, ব্লো-পাইপ! আমি তো জানতাম ও-অস্ত্র ব্যবহার করে বোর্নিওর লোকরা—

—না, বললো বার্নি, দক্ষিণ আমেরিকাতেও ব্লো-পাইপের ব্যবহার আছে। এ-শলাকা থাকে বিষাক্ত, আহত হলে আর আমাদের রক্ষা নেই। এই অস্ত্রের হাত এড়িয়ে পালানো ঠিক মরীচিকার সামিল।

ইতিমধ্যে লাল-মানুষেরা ওদের ক্যানো থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে ছোটো-ছোটো প্যাকেট করে সব কিছু বেঁধেছেদে নিলো। তারপর বন্দীদের নিয়ে প্রবেশ করলো অরণ্যের গভীর অন্ধকারে।

## ॥ জংলিদের হাতে ॥

যদিচ জংলিরা তাদের বন্দীদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করলো না, তবু তারা বলপ্রয়োগ করেই বন্দীদের নিয়ে অরণ্য-পথ ধরে চলতে থাকলো। পদব্রজে দীর্ঘ পথ চলায় অভ্যস্ত না থাকায় সহজেই বার্নি আর মার্টিন অবসন্ন হয়ে পড়লো। মুলাটো-বণিক আজন্ম ব্রেজিলের অরণ্যে আছে। কাজেই সমস্ত রকম দুর্দশা সহ্য করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। নীরবে সে তাই এগোতে পারছিলো।

কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা চলবার পরে একদিন সূর্যাস্তের সময়ে লাল-মানুষেরা এক সুন্দর উপত্যকায় এসে পৌঁছলো। যথারীতি সেখানে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাসের কাজে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পার্বত্য এক গুহাদেশের মুখে আস্তানা ঠিক হলো। আশেপাশে বিশাল অরণ্য।

সেখানে মধ্যখানে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে লাল-মানুষেরা ইতস্ততঃ এদিকে-ওদিকে জায়গা নিলো। আর আগুনের কুণ্ডে গা ঘেঁষে বসে রইলো বন্দী তিনজন। জংলিদের দেওয়া ফলমূল খেয়ে রাত্রির আহার সাঙ্গ করে মুলাটো-বণিক বেশ স্বচ্ছন্দেই শুয়ে পড়লো, কিন্তু বার্নি আর মার্টিনের সহজে ঘুম এলো না।

মার্টিন অকস্মাৎ গম্ভীর গলায় বললো, বার্নি, এক সপ্তাহ ধরে রাস্কেলদের সঙ্গে চলতে চলতে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি,—অসহ্য লাগছে যেন। কী করে পালানো যায় শুধু সেকথাই ঘুরছে-ফিরছে মনের মধ্যে। এ ছাড়া আমি একটা সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে ফেলেছি।

—সেটা কী ? জানতে চাইলো মার্টিন।

—সেটা হলো পালানোর চেষ্টা আদৌ সম্ভব নয় এবং এখন কী করা কর্তব্য সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমার মাথা ঘুলিয়ে গেছে।

—তোমার সিদ্ধান্তটা কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক নয় বার্নি। এই জঙ্গলিদের সম্পর্কে আমি এ কদিন যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আমার মতে এরা লড়াই করতে বেরিয়েছিলো। কারণ এদের কয়েকজনের গায়ে মারাত্মক রকম ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া আর কী কারণে যে এরা এদের আস্তানা ছেড়ে এতোদূরে এসে পড়তে পারে, সেইটে আমার মাথায় আসছে না।

—তোমার আন্দাজ মোটেই মিথ্যে নয়, মার্টিন। কিন্তু আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবছি এরা আমাদের নিয়ে কী করতে চায়। আপাতত এরা আমাদের হত্যা করতে চায় না। কারণ তাহলে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার হাঙ্গামা এরা পোয়াতো না। কিন্তু তবু আমি কিছুমাত্র আশার আলো দেখতে পাচ্ছিনে কোনো দিকে। এখন আমরা যে ঠিক কোন্‌খানে আছি তাই আমি ভালো করে বুঝতে পারছিনে।

কোনো রকমে শুকনো করে হাসলো মার্টিন। বললো, খামোকা ভেবে-ভেবে মন-খারাপ করে কী লাভ বার্নি? যা হবার তাই হবে। ওরা তো এখন আমাদের হত্যা করতে চাইছে না সেইটেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে স্থবিধের। একথা আমি নিশ্চিত জানি, একদিন না একদিন আমরা পালাতে পারবোই।

আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে ওরা শুয়ে পড়লো। মার্টিনের কিন্তু সহজে ঘুম এলো না। ডরোথি-পিশির কথা, ক্রোকারের কথা, অশফোর্ডের পাদ্রিমশায়ের কথা তার মনে পড়তে লাগলো।

পরদিন সকালবেলা দেখা দিলো বিপদ। কারণ জঙলিরা সকাল বেলায় এক সঙ্গে না চলে দু-দলে ভাগ হয়ে গেলো, এবং বন্দী তিন জনকেও দুদলে ভাগ করে দেওয়া হলো। এক দলে নেওয়া হলো বার্নি আর সেই মুলাটো-বণিককে, অন্য দলে মার্টিনকে।

বার্নি কিন্তু সহজে এই ছাড়াছাড়িটা মেনে নিতে পারলো না। সে রীতিমতো মারামারি শুরু করে দিলো। উদ্দেশ্য, যাতে মার্টিনের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু জঙলিরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলো বলে বার্নির সেই চেষ্টা তো সফল হলোই না বরং মারামারি করতে গিয়ে তার দেহ ভীষণরকম রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তবু ভাগ্যিস, জঙলিরা তাদের ব্লো-পাইপ ব্যবহার করেনি তাকে শায়েস্তা করতে। যদি করতো, তবে—ভাবতেও শিউরে উঠলো মার্টিনের গা।

খানিকক্ষণ চলার পর মার্টিন পিছন ফিরে তাকালো, বার্নিদের দলকে দেখা যায় কি-না দেখতে। কিন্তু না, দেখা যায় না। ব্রেজিলের এই দুরন্ত অরণ্যে এই দুর্গম পথে জঙলিদের হাতে বার্নি আর মার্টিনের সত্যি-সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে!

জঙলিদের গ্রামে পৌঁছোবার কিছুকাল পরেই আকারে-ইঙ্গিতে জঙলিরা মার্টিনকে বোঝালো যে বিশেষ একটি পরিবারের সঙ্গে তাকে বাস করতে হবে এবং তাদের হয়ে তাকে কাজকর্ম করতে হবে। মার্টিন সহজেই বুঝতে পারলো যে আসলে তার অবস্থা এখন এক ক্রীতদাসের মতো। এমনিতেই বার্নির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুণ তার মন খারাপ হয়েছিলো, তার উপরে এই ক্রীতদাসের জীবন। মার্টিন একেবারে ভেঙে পড়লো। যন্ত্রের মতো সে জঙলিদের হুকুম মতো মাঠে-বাড়িতে কাজ করতে লাগলো। ক্রমে সাহসে সে বুক বেঁধে নিলো। এখন থেকে তার প্রধান চিন্তাই হলো, কী করে পালানো যায়। সময়ে-অসময়ে মনে পড়ে দেশের কথা, ডরোথি-পিশির কথা, মনে পড়ে বার্নির ভাবনা, আর তার চোখ ফেটে কান্না আসতে চায়।

কর্মঠ মার্টিন কিন্তু অল্পদিনেই জঙলিদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। অল্পদিনের মধ্যেই ধনুক-বাণ আর ব্লো-পাইপ ব্যবহারে সে রীতিমতো ওস্তাদ হয়ে উঠলো। ফলে জঙলিরা তাকে ছোটোখাটো শিকার-অভিযানে সঙ্গে

করে নিয়ে যেতো। এই সব শিকার-অভিযান একদিক থেকে তার পক্ষে সুবিধেরই হয়েছিলো। জঙলিদের সঙ্গে থেকে-থেকে অরণ্যকে সে চিনতে শিখেছিলো, বুঝতে শিখেছিলো বুনো জানোয়ারদের স্বভাব। এছাড়া কয়েক মাসের মধ্যে জঙলিদের ভাষায়ও তার মোটামুটি একটা দখল এসে গেলো। সেই কারণে এখন আর তাকে আগের মতো অসহ্য নীরবতা সহ্য করতে হতো না। দু-একটা কথা বলতে পেরে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেলো সে। কিন্তু তাই বলে সে একেবারে স্বাধীন ছিলো না। লম্বা-চওড়া একটা জঙলি সর্বদাই মার্টিনকে চোখে-চোখে রাখতো। সেই লোকটি কথাবার্তা বলতো কম এবং মার্টিনের সঙ্গেও চলতো-ফিরতো না। কিন্তু সর্বদাই একটু দূরে থেকে সে মার্টিনকে নজরে রাখতো। শেষে এমন হলো যে, মার্টিন তাকে নিজের ছায়া বলেই গণ্য করতে সুরু করে দিলো।

একদিন সূর্যাস্তের সময়ে টিলার চুড়োয় বসে দূর গিরিমালার দিকে সোনালি সন্ধ্যের সুন্দর দৃশ্য দেখতে-দেখতে তার মনে পালাবার ইচ্ছা উদগ্র হয়ে উঠলো! কিন্তু সেই 'ছায়া' যে ব্লো-পাইপ নিয়ে সর্বদাই তাকে অনুসরণ করছে। যদি-বা কোনোমতে কখনো সেই কায়াময় ছায়ার ব্লো-পাইপের ইস্পাতের তীক্ষ্ণ শলাকা এড়ানো যায়, অল্পক্ষণ পরেই শত-শত জংলির ব্লো-পাইপের তীর এসে বিদ্ধ করবে ওকে। জঙলিদের ড্রামের অসীম শক্তির কথা সে ইতিমধ্যেই ভালো করে জেনে নিয়েছে। অবশ্য সেই ছায়াকে অনায়াসেই মার্টিন

হত্যা করতে পারে। কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হবে না। ছায়া এবং মার্টিন—উভয়ে একযোগে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হলেই জংলিদের দামামা দ্রিম দ্রিম শব্দে বেজে উঠবে।

কি করবে বুঝতে না পেরে মার্টিন মন খারাপ করে টিলার চূড়োয় বসে রইলো। টিলার চূড়োটা বিপরীত দিকে সোজা নেমে গেছে—খাড়াইয়ের মতো। অকস্মাৎ সেই চূড়ো থেকে মার্টিনের চোখ পড়লো নিচের দিকে। একটা ঝরণা শব্দ করে ভয়ানক বেগে বয়ে চলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে মার্টিনের মনের ভিতর পালাবার একটি পরিকল্পনা জেগে উঠলো।

ঝরণাটা দক্ষিণ আমেরিকার অন্য অনেক ঝরণার মতোই উপলবহুল পার্বত্যপথে কিছু পথ দ্রুতবেগে চলে তারপর অকস্মাৎ প্রপাতের মতো নিচে নেমে গেছে। প্রপাতের মতো জায়গাটা একটু বেঁকে গেছে। সেখানে একটা বড় পাথর জল থেকে শূন্যে মাথা তুলে আছে বলে সেখানটায় প্রবল একটা ঘূর্ণির মতো দেখা গেলো। পাথরটা খুব উঁচু, কিন্তু ছোট। চেষ্টা করলে কেউ হয়তো কোনো রকমে ওটাকে জড়িয়ে ধরে জলের তোড় থেকে বাঁচতে পারে। ঐ পাথরটাই মার্টিনের একমাত্র আশা। ওটাকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে বিপর্যয় অনিবার্য। কিন্তু একবার ওটাকে ধরতে পারলে অরণ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে পারাটাই খুব সহজ ব্যাপার।

এখন মার্টিনের একমাত্র কাজ হলো, এই টিলার চূড়ো থেকে এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া যাতে জংলিরা মনে করে যে দৈবাৎ সে ঝরণার জলে পড়ে গিয়ে ডুবে মরেছে। এইভাবে

অভিনয় করে ঝাঁপিয়ে পড়াটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। পিছন ফিরে মার্টিন দেখতে পেলো, তার জঙলি প্রহরী বেশ খানিকটা নিচে দাঁড়িয়ে দূর গিরিমালার সোনালি সূর্যাস্ত চেয়ে দেখছে।

সহজভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অসতর্ক ভঙ্গিতে মার্টিন চূড়োর উপর হাটতে লাগলো। নিচের দিকে একবার তাকালো। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে তার হৃৎপিণ্ড একবার ধ্বক করে উঠলো যেন। পরমুহূর্তেই এই বন্দী-জীবনের কথা মনে পড়লো তার। হাত দুটো শূন্যে তুলে কিছুক্ষণ দুলালো সে। তারপরই শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে সে নিচে পড়তে থাকলো; তার আর্তগলার তীব্র চিৎকারে সন্ধ্যেবেলা যেন কেঁপে উঠলো। জলে পড়ে পরমুহূর্তেই সে আবার ছিটকে উঠলো শূন্যে, তারপর আবার জলের তলায় ডুবে গেলো তার শরীর।

হরিণের মতো দ্রুত পায়ে জঙলিটা ঝরণার কাছে ছুটে এসে দেখতে পেলো, মার্টিনের লোহার টুপিটা প্রপাতের কাছের ঘূর্নিতে বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে প্রবলবেগে তার নিচে আছড়ে পড়লো।

## ॥ অরণ্যের অন্ধকারে ॥

যারা কিছুকাল দাসত্ব ভোগ করেছে, কেবল তারাই জানে স্বাধীনতার মর্ম। পার্বত্যপথ দিয়ে চলতে-চলতে চারপাশের সুন্দর বনভূমির দিকে হাল্কা মনে তাকাতে পেরে মার্টিনের

মনে যে কী পরিমাণ আনন্দ হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এখন তার কী করা উচিত সেইটেই হলো ভাবনার কথা। আবহাওয়া বেশ উষ্ণ। ভিজে পোষাক থেকে জল নিংড়ে ফেলার পর বেশ ভালোই লাগলো তার। কিন্তু রসদ কিংবা অস্ত্রসস্ত্র ছাড়া এই অরণ্যদেশে চলাফেরা করা যে কী সাংঘাতিক তা সে ভালোই জানে। তাই সে ঠিক করলো, মধ্যরাত্রির অন্ধকারে জঙলিদের গ্রামে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসবে। ঝুঁকি তার কম নয়। হয়তো আবারো বন্দী-জীবন বরণ করতে হতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি !

মধ্যরাত্রির অন্ধকারে তাই আবার লাল-মানুষদের গ্রামে দেখা গেলো মার্টিনকে। ঘুমন্ত গ্রাম। নিঃশব্দ। সন্তর্পণে একটি কুটিরের কাছে এগিয়ে এসে খোলা জানলা দিয়ে মার্টিন উঁকি দিলো। কিছুই দেখা বা শোনা গেলো না। কিন্তু ঘরের চৌকাঠের কাছে এসেই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে সে থমকে গেলো। দ্রুতপায়ে পুনরায় সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। আশঙ্কায় উত্তেজনায় বুক তার ঢিপঢিপ করছে।

কিছুক্ষণ পর আবার সাহসে বুক বেঁধে অন্য একটা কুটির লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো সে। এই কুটিরটায় কেউ আছে বলে বোঝা গেলো না। সন্তর্পণে পামগাছের পাতার দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলো মার্টিন। একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট

করবার মতো নয়। একটা খালি ব্যাগ দেখতে পেলো সে ঘরের এক কোণে। দ্রুতহাতে সেই ব্যাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় রসদ ভরে নিলো। তারপর দীর্ঘ একটি ছুরি, একটা ছোটো কুড়ুল, আগুন জ্বালবার জন্মে দুটি চকমকি পাথর, একটি ধনুক ও তীর-ভরা তূণ সে সঙ্গে নিলো। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এক কোণে একটা দড়ির ঝোলানো খাট দেখতে পেয়ে সেটাও বাণ্ডিল করে নিল। আর নিলো একটা শোলার টুপি।

যা-কিছু দরকার সমস্তই এবার মার্টিনের হস্তগত। তাই উৎফুল্ল মনে সে কুটির পরিত্যাগ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে আচমকা ধ্বক করে উঠে স্তম্ভিত হয়ে যেতে চাইলো তার হৃৎপিণ্ড। কুটিরের অন্য প্রান্তে একটি ঝোলানো খাটে শুয়ে একটি লাল-মানুষ গোল-গোল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে অনভ্যস্ত চোখে সে প্রথমে লাল-মানুষটিকে দেখতে পায়নি। এবার তা হ'লে আর রেহাই নেই। আবার তবে সেই পুরানো বন্দী-জীবন। হতাশায় মার্টিন একেবারে ভেঙে পড়লো।

এমন সময়ে আচমকা তার চোখে পড়লো যে, লাল-মানুষটির দুই চোখে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে দুরন্ত ভয় এবং আচমকাই মার্টিন বুঝতে পারলো যে, লাল-মানুষটি তাকে প্রেতমানুষ ভেবেছে। অমনি আশায় ভর করে মার্টিন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সন্তর্পণে লাল-মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলো। ভূতের ভয়ে লাল-মানুষটির সারা শরীর তখন শিউরে-শিউরে উঠছে!

তখন মার্টিন নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

গেলো। অরণ্যের প্রান্তে পৌঁছেই সে উন্মত্তের মতো ছুটতে লাগলো। ভাগ্যিস লাল-মানুষটি তাকে ভূত ভেবেছিলো, নইলে এবার আর রেহাই ছিলো না।

অরণ্যের গভীরে ঈষৎ নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে প্রথমেই মার্টিন চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালালো। তারপর সঙ্গে-আনা ব্যাগটির ভিতর থেকে ফলমূল বের করে আহারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খাওয়া-দাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন সে দেখতে পেলো ছ' ফুট লম্বা একটি সাপ এঁকেবেঁকে তার পাশ ঘেঁষে চলে গেলো। ছোটো কুড়ুলটার এক আঘাতেই সে সাপটিকে দ্বিখণ্ড করে ফেললো। তারপরে দুটি গাছের ডালে দড়ির খাটটা ঝুলিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে তার উপরে উঠে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মার্টিন র‍্যাটলারকে একা, সম্পূর্ণ একা চলতে হলো ব্রেজিলের সেই গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। পথে কতো যে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে সে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

অনেক দিন ধরে একা-একা পথ চলে মার্টিন যখন মানুষের মুখ দেখবার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, তখন আচমকা সে বনের মধ্যে পায়ে-চলা একটা পথ দেখতে পেলো। দুমড়ানো গাছপালা, পায়ের নিচে পিষে-যাওয়া ঘাস—এইসব দেখে সে বুঝতে পারলো যে, এইপথে মানুষের আনা-গোনা আছে। তার মন আবার আশায় ভরে উঠলো।

সেদিন ছিলো শনিবার। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছিলো। ঐ পায়ে-চলা পথের পাশে একটা গাছের ডালে সে ঝোলানো খাট টাঙিয়ে রাতটা কাটাবে বলে ঠিক করলো। অনেকদিন পরে সেদিন হঠাৎ আবার ডরোথি-পিশির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ছিলো। ফলমূল এবং ঝলসানো মাংস দিয়ে রাত্রির আহার শেষ করে সে তার ঝোলানো শয্যায় আশ্রয় নিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে যখন ঐ পথ ধরে রওনা হবে, তখন সে মানুষের গলা শুনতে পেলো কাছেই। ঘোড়ার খুরের শব্দও শোনা যাচ্ছিলো। অল্প একটু চিন্তা করে সে পাশের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'জন ব্রেজিলবাসীকে আসতে দেখা গেলো। যখন ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে তখন মার্টিন ঝোপ থেকে বেরিয়ে কম্পিত গলায় অভিবাদন জানালো। আচম্বিতে তার গলা শুনেই ঘোড়সোয়ার দু'জন একযোগে বেল্ট থেকে পিস্তল বার করলো। কিন্তু যখন তারা ধনুকবাণ হাতে মার্টিনকে দেখতে পেলো তখন পিস্তলগুলি আবার বেল্টে গুঁজে রাখলো। বিস্ময়ে তারা প্রথমটা স্তম্ভিত-বাক হয়ে রইলো, পরে একসঙ্গে সবাই মিলে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে উঠলো।

মার্টিন একটু কাছে এসে জিগ্যেস করলো, আপনাদের কেউ ইংরিজি জানেন?

একজন ঘোড়সোয়ার অশুদ্ধ উচ্চারণে বললো, আমি একটু

একটু জানি। খুব সামান্যই। কিন্তু এখন বলো তো কোত্থেকে আসছো তুমি ?

—ঐ পাহাড়গুলি ছাড়িয়ে যেখানে লাল-মানুষদের গ্রাম আছে, আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসছি। কয়েক সপ্তাহ হলো একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—হুঁ, গম্ভীর গলায় ঘোড়সোয়ার বললো, আচ্ছা, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা হিরের খনির দিকে যাচ্ছি মালপত্র নিয়ে। ওখানে গেলে তুমি কাজ পেতে পারো কিছু কিংবা সমুদ্রে পৌঁছানোর চেষ্টাও করতে পারো। যাও, ঐ ঘোড়াটায় গিয়ে চেপে বসো।

মার্টিন গিয়ে নির্দিষ্ট ঘোড়াটায় চেপে বসতেই আবার অরণ্যপথ ধরে তারা চলতে শুরু করে দিলো। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মার্টিন তার পর্তুগিজ ভাষার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান এবং ব্রেজিলবাসিটির অশুদ্ধ ইংরিজির সাহায্যে জানতে পারলো যে, তারা ব্রেজিলের হিরের খনি অঞ্চল মাইনাস জেরায়েসে একদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

মাইনাস জেরায়েস অবশ্য সমুদ্রতীর থেকে অনেক লিগ দূরে। তবে মার্টিন সম্ভবত অনায়াসেই হিরের খনিতে কাজ পাবে, কারণ চীফ-ওভারসিয়ার ব্যারন ফ্যাগনি খুব ভদ্রলোক এবং ইংরেজদের খুব ভক্ত। তবে তিনি ইংরিজি বলতে পারেন না, দোভাষির সাহায্য ছাড়া তার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো মুস্কিলের ব্যাপার। আর, ব্রেজিলবাসীটি খুব ভারিক্কি চালে বললো, আমিই তাঁর দোভাষি।

মার্টিন বললো, আমার সৌভাগ্য যে আমি ইতিমধ্যেই আপনার বন্ধুত্ব লাভ করেছি।

দোভাষি ঈষৎ হেসে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন করলো, তারপর নীরবে তারা পথ চলতে লাগলো।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় তারা হিরের খনিতে পৌঁছলো। দোভাষি প্রথমে তার পরিবারের কুশল সংবাদ নিলো, তারপর মার্টিনকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো ওভারসিয়ারের বাড়িতে।

ব্যারন ফ্যাগনি তখন তার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিলেন। তাঁর চেহারা দেখে মার্টিন খুব একটা আশান্বিত হলো না। লাল দাড়ি আর লাল চুল ব্যারনের। বিরাট দেহ, ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের এক দৈত্য। এছাড়া তাঁর টুপিটা দেখতে সম্বেরোর মতো—সমস্ত মুখ ঢেকে ছিলো সেই টুপি।

দোভাষি তাকে পর্তুগিজ ভাষায় মার্টিন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানালো। উত্তরে তিনি কর্কশ গলায় কী যেন বললেন. একবার ফিরেও তাকালেন না ওদের দিকে। দোভাষি বিস্মিত হয়ে আবার কথা বলবার চেষ্টা করতেই ওভারসিয়ার গম্ভীর গলায় তাঁর হুকুম পালন করবার আদেশ দিলেন।

তাঁকে অভিবাদন করে দোভাষি মার্টিনকে নিয়ে ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে বসালো। তারপর ঘরের জানালাগুলি ভালো করে বন্ধ করে মার্টিনকে বললো, ব্যারন বললেন যে তুমি নাকি এক হতভাগা চোর, এদেশ থেকে হিরে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছো। তাই উনি তোমাকে বন্দী করলেন। আমি এবার চলি।

এই বলে দোভাষি ওকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগালো। বিস্ময়ে হতবাক এবং বিমূঢ় মার্টিন ঘরের মধ্যে নির্বাক হয়ে বসে থাকলো। দোভাষিকে একটি কথা বলবার চেষ্টা করতেও সে তখন যেন ভুলে গেছে !!

## ॥ মুঠো মুঠো হিরে ॥

কিন্তু বিমূঢ় মার্টিনের জন্যে তখনো আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিলো। ও যখন বন্দী হলো, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা কাল একলা সে ঐ ঘরে অন্ধকারে বসে রইলো। এদিকে খিদেয় তখন পেট চোঁ-চোঁ করছে। প্রাতরাশ করেছিলো সেই সকালে, তারপর আর কিছুই খায়নি। অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে সে তখন পালাবার উপায় ভাবছিলো; এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেলো এবং দরজার সামনে দেখা গেলো আলো হাতে একটা কাফ্রি দাঁড়িয়ে।

কাফ্রিটি এ ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর মোমবাতি চারটে রাখলো, তারপর আবার দরজার কাছে ফিরে গেলো। দরজার কাছে আরেকটি কাফ্রি একটা ট্রে-হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। ট্রে-তে নানা রকম খাবার দাবার। মার্টিনের দিকে একবারও নজর না দিয়ে তারা টেবিল সাজালো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বিস্মিত ও ক্ষুধার্ত মার্টিন ঐগুলিকে সোৎসাহে আক্রমণ

করবে কি না ভাবছে, এমন সময়ে ঘরের দরজা খুলে গেলো এবং ব্যারণ ফ্যাগনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর মার্টিনের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। মার্টিন বুঝতে পারলো সম্‌ব্রেরোর নিচ থেকে এক জোড়া চোখ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে।

মার্টিন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি যদি আমার সঙ্গে কৌতুক করতে চান তবে যথেষ্ট হয়েছে। যদি সত্যিই আমাকে আপনি বন্দী করে রাখেন, তবে এভাবে কৌতুক করে আমাকে আর ক্ষত-বিক্ষত করবেন না।

মার্টিনের এ কথার উত্তরে কোন কথা না বলে ব্যারন মার্টিনকে আলিঙ্গন করলেন। বিস্মিত মার্টিন তাঁর প্রসারিত বাহুর কঠিন পেষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শুনতে পেলো পরিচিত গলা, ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ! আমি তো ভেবেছিলাম জংলিরা তোমায় একেবারে খতম করে দিয়েছে মার্টিন!

যেই না এই কথা শোনা, মার্টিন অমনি লাফিয়ে উঠলো। তারপরে বার্নি আর মার্টিনের মধ্যে যে কত কথা হলো, তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু বলা দরকার যে আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কাটলে পর মার্টিন বসলো আহারে, আর বার্নি পাইপ থেকে মুখ নামিয়ে বলতে শুরু করলো তার কথা।

—জানো মার্টিন, বলতে থাকলো বার্নি, আমি এখানে এসেছি মাত্র চার মাস হলো। এই হিরের খনির মালিক এক

আইরিশ ভদ্রলোক। খুব ভালো মানুষ। আমার গলা শুনেই উনি আমাকে তাঁর কাজে লাগিয়ে দেন। তারপর কিছুদিন পর আমার কাজকর্ম দেখে খুশি হয়ে একদিন বললেন, 'বার্নি, এভাবে দিন কাটাতে আমার আর ভালো লাগছে না। যদি তুমি এখানে ওভারসিয়ার হয়ে থাকতে রাজি হও এবং রিয়ো ডি জানেরিয়োতে রীতিমতো হিসেব-পত্তর পাঠাও, তবে তোমাকে লাভের অংশিদার করে নেওয়া হবে। কিন্তু তোমাকে রুশিয়ান কিংবা পোলিশ কিংবা ঐ ধরণের কোনো এক দেশের লোক বলে ভান করতে হবে। এখানকার লোকজনেরা সব রাস্কেল, যদি জানতে পারে যে তুমি কোনো জাহাজের সামান্য একজন নাবিকমাত্র, তবে তোমাকে নির্ঘাৎ ফাঁকি দেবে। মারধোরও করতে পারে। কিন্তু যদি তুমি রুশ কথা বলতে পারো, তবে ওরা বুঝতেই পারবে না যে তুমি একজন ইংরেজ। তার আগে দাড়ি গজাতে দিতে হবে বড়ো করে, আর সাজপোষাক করতে হবে ঐ রকম। তবে আর কোনো রকম ভয় থাকবে না।

আমি বললাম, কিন্তু আমি যে ইংরিজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারিনে।

উনি জানালেন, তার জন্যে ভাবতে হবে না। এক-দু'মাসের মধ্যে তোমাকে ভালো রকম পর্তুগিজ ভাষা শিখিয়ে দেবো আমি। তখন আর কোনো রকম ভয় থাকবে না এবং সত্যি বলতে কি মার্টিন, অল্পদিনের মধ্যেই আমি বেশ শিখে ফেললাম পর্তুগিজ ভাষা। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনের বেশি একটি শব্দও উচ্চারণ করিনে, কাজেই ধরা পড়বারও আশংকা নেই।

মার্টিন বললো, তার মানে আসলে তুমি এখন খনির তদারক করছো ?

—হ্যাঁ মার্টিন, উত্তর করলো বার্নি, কিন্তু আমার কাছে এই জায়গাটা ইতিমধ্যেই অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। কাজেই কাজ ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছি আমি। আবার আমাকে সমুদ্র ডাক দিচ্ছে।

—কিন্তু খনির মালিক কী বলবেন তবে ?

—কিচ্ছু না। কারণ উনি আগেই বলে দিয়েছেন যে, এখান থেকে চলে যেতে হলে যেন দোভাষির কাছে সমস্ত ভার সমর্পণ করে দিয়ে যাই। কাজেই এখন দু-একটা হিরে পকেটস্থ করে আমি ছুটি চাইবো।

—তাতো বুঝলাম। কিন্তু তোমার নাম ব্যারন ফ্যাগনি হলো কী করে ?

—ও, সেই কথা ? এখানে এসে সৌভাগ্যবশত প্রথম আমার দেখা হয়েছিলো মালিকের সঙ্গে এবং আমাদের কথাবার্তা চলেছিলো বিশুদ্ধ আইরিশে। কাজেই আমি কোত্থেকে এসেছি তা কেউ জানতে পারেনি। দোভাষি শুধু মালিকের মুখে আমার নাম শুনতে পেয়েছিলো। শুনে বলে বেরিয়েছিলো আমি নাকি বার্ণো ক্ল্যানাগনি। কিন্তু আমরা পরে সে-নাম সংশোধন করে জানালাম যে আমার নাম ব্যারন ফ্যাগনি, সে শুনতে ভুল করেছে। সেই থেকেই আমার ব্যারন ফ্যাগনি নাম চালু হয়েছে। বুঝলে ? এবার শোনো, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে কী ঘটে।

বার্নি যা কইলো তার সারমর্ম হলো এই :

মার্টিনের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হলে পর লাল মানুষরা বার্নিকে শক্ত করে বেঁধে নিলো। তারপর দিনকয়েক ধরে একটানা অরণ্যপথ ধরে চললো পথচলা। শেষে কয়েকদিন পরে পাহাড়ের নিচে জংলিদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছনো গেলো। এখানে বন্দী হিসেবে তিন সপ্তাহ তাকে ঘরে আটক হয়ে থাকতে হয় কড়া পাহারায়। শুধু এক বুড়ি লালমানুষ তাকে খাবারদাবার দিয়ে যেতো। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছিলো অসম্ভব। কারণ সে ইংরেজি জানে না। তবে ভাবে ভঙ্গিতে অবশ্য অল্প ক'দিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

তারই ফলে একদিন বার্নিকে খাবার দিয়ে যাবার সময়ে বুড়িটি পোষাকের মধ্য হতে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে বার্নির পায়ের কাছে এমন ভাবে ফেলে রেখে গেলো যেন দৈবাৎ ঘটে গেছে ব্যাপারটা। দুরুদুরু বুকে বার্নি ছুরিটা তুলে তার পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো।

রাত্রি গভীর হলে সে তার বাঁধন কেটে দরজার সামনে এসে পুরনো দরজাকে ভেঙে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো। ডান হাতে তার উন্মুক্ত ছুরিকা। একটু এগোবার পর সে পেছনে চীৎকার শুনতে পেলো। বুঝতে পারলো, জংলিরা জানতে পেরেছে এবং পিছন-পিছন ছুটে আসছে। উন্মত্তের মতো ছুটতে-ছুটতে বার্নি যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখানে এক

পাহাড়ি নদী তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। কোনো দিকে দৃকপাত না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বার্নি, তারপরে উঠলো গিয়ে একেবারে ওপারে। তারপর সেখানে বড়ো একটা গাছে উঠে লতা-পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। এদিকে পাহাড়ি নদীটার সামনে এসে তখন জমায়েৎ হয়েছে জংলিরা। কিন্তু নদীর আশেপাশে বার্নির কোনো চিহ্ন না দেখতে পাওয়ায় তারা খুব অবাক হয়ে গেলো। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করে একদল গেলো বনের ভিতরে অন্যদল নদীতীরেই খোঁজাখুঁজি করতে থাকলো।

এদিকে গাছের ডালে বসে বার্নির বুক তখন দুরুদুরু করছে। এই বুঝি তারা ধরে ফেলে ওকে। কিছুক্ষণ পর সে আর সেই অস্বস্তি সহ্য করতে না পেরে সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমে অরণ্যের গভীর অন্ধকারে গিয়ে ঢুকলো। ওপারে তখন জংলিরা ওকে খুঁজে-খুঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। যেতে-যেতে সে আবার আরেকটা পাহাড়ি নদীর তীরে এসে পৌঁছালো। আবার সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময়ে তার চোখে পড়লো নদীতীরে জংলিদের একটি ক্যানো বাঁধা আছে। দ্রুতপায়ে গিয়ে সে ক্যানোতে উঠলো, তারপর নদীর স্রোতের দিকে নৌকো ছেড়ে দিলো। নদীতে স্রোত সাংঘাতিক রকম। তীরের মতো ছুটে চলতে থাকলো ক্যানো। দু-একবার তীরের পাথুরে গায়ে ধাক্কা লেগে প্রায় চুরমার হয়ে যাবার মতো হলো, কিন্তু তবু বার্নি ঘাবড়ালো না।

ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর নদীটা আবার বাঁক ফিরে এসে

মিললো আগেকার সেই চওড়া নদীতে। তখন অবশ্য লাল-মানুষদের গ্রাম অনেক পিছনে পড়ে আছে। কিন্তু তবু ক্যানো থামাবার সাহস বার্নির হলো না। সারা রাত্রি সে একটানা নৌকোর হাল ধরে থাকলো। তারপর সূর্যোদয় হলে তীরে ক্যানো বেঁধে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিলো সে। ঘুম ভাঙলে পর বনের ফলমূল দিয়ে প্রাতরাশ সাঙ্গ করে আবার নদীপথ ধরে চলতে থাকলো।

পরদিন ঐ-রকম ভাবে যেতে যেতে এক বণিকের ক্যানোর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। বণিক তখন ক্যানো ভর্তি রবারের জুতো নিয়ে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন ব্রেজিলবাসী। কিন্তু সেই চারজন ব্রেজিলবাসীর একজনও ইংরেজি কথা বলতে পারে না। তারা শুধু এইটুকু আকারে ইংগিতে বুঝতে পারলো যে বার্নি লালমানুষদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে এবং এখন মহা দুরবস্থার মধ্যে আছে। সহজেই বার্নিকে তারা তাদের দলে টেনে নিলো। তিন সপ্তাহ পরে তারা একটা ছোট্টো শহরে এসে পৌছালো। সেখানে ব্রেজিলবাসীরা রবার দিয়ে জুতো, বোতল ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা উপার্জন করে। বার্নি এখানে কিছুকালের জন্যে কাজ পেলো।

বার্নি কিন্তু এখানে বেশি দিন কাজ করতে পারলো না। জুতো তৈরি করা তার কর্ম না, এই বলে সে কিছুকাল পরেই কাজে ইস্তফা দিয়ে দিলো। এবং ব্রেজিলের আরো অভ্যন্তরে হিরের খনির অঞ্চলের দিকে কয়েকজন বণিক রওনা হচ্ছেন

শুনতে পেয়ে সে তক্ষুণি তাদের দলে যোগ দিলো। এবার কিন্তু বেশ কিছুকাল চলতে হলো বার্নিকে। কখনো ক্যানোয় কখনো বা ঘোড়ায়।

অবশেষে বহু আকাঙ্খিত হিরের খনি এলাকায় পৌঁছনোর পর বার্নির কী ঘটলো তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এখন যখন মার্টিনও এখানে এসে পৌঁচেছে, তখন দুজনেরই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, বললো বার্নি, যে কোনো রকমে সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছনো!

## ॥ প্রত্যাবর্তনের পথ ॥

শিরার ভিতরে রক্ত যখন আনন্দে নাচে, তখন যে রোমাঞ্চ হয় সেটা পুলকের। বার্নি আর মার্টিনের মনে হলো ব্রেজিলে এতো চমৎকার, এতো নির্মল, এতো অনাবিল, আবার এতো উজ্জ্বল সন্ধ্যা কখনো তারা দেখেনি। বিশাল তৃণপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটেছে তাদের ঘোড়া, ঠকঠক শব্দ হচ্ছে খুরের, বুকের মধ্যে নাচছে বাড়ি যাবার আশা। শরীরের কথা বলতে গেলে তারা খুবই পরিশ্রান্ত, প্রাণ কিন্তু তখনো স্বাধীনতার স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ।

—এর চেয়ে ভালো বোধ হয় আর কিছুই নেই পৃথিবীতে—মানে এই ঘোড়ায় চড়ার মতো, চেঁচিয়ে বললো মার্টিন। ঘোড়া দুটি এতো ভালো জাতের যে মনে হচ্ছে যেন কক্ষণো পরিশ্রান্ত হবে না। অবশ্য পথটাও খুব ভালো, এবড়োথেবড়ো নয়।

বার্নিও মার্টিনের পাশে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে চলছিলো। সেও চেঁচিয়েই বললো, লাগামটা ভালো করে ধরে রাখো, নইলে কিন্তু পড়ে যাবে।

সমুদ্রতীরের আর বেশি দূর নেই। তাই ওদের আনন্দেরও যেন সীমা নেই। কদিন ধরে ক্রমাগত ওরা ঘোড়ায় করে ছুটে চলেছে সমুদ্র তীরের দিকে। বার্নির পকেটে আছে কয়েকটি ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকারের হিরে। পারিশ্রমিক হিসেবে এগুলো তার প্রাপ্য হয়েছে। এছাড়া মালিকের উপহারও আছে দুটো হিরে। টাকার কোনো ভাবনা নেই। সমুদ্রতীরে গিয়ে ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জগামী জাহাজের টিকিট কেটে উঠে পড়াই বাকি শুধু। তারপর যখন সমুদ্রের নীল জলের উপর দিয়ে রূপোলি রাজহাঁসের মতো জাহাজ চলবে, তখন আনন্দে শুধু ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের মায়াবী নীলিমাকে দুচোখ ভরে দেখা, আর শুধু প্রতীক্ষা করা, কতো দিনে পৌঁছোবে দেশে।

কয়েকদিন পরে দোতলা ডেকের রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চাদগামী জলধারার ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো মার্টিন। কখন যে সারাদিনের ডানপিটে দুরন্ত হাওয়া আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে রঙিন সূর্যাস্তের শেষ লগ্নে দম বন্ধ করে একেবারে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তা সে টেরও পায়নি। সম্বিত তার ভাঙলো তখন, যখন বার্নি এসে তার কাঁধে হাত রাখলো।

বার্নির দিকে না তাকিয়েই মার্টিন বললো, যা-ই বলো না কেন বার্নি, এই কয়েকদিনে ব্রেজিলের অরণ্যকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম, জীবনে আর কখনো একে ভুলতে পারবো না। স্বপ্নে হয়তো কতোদিন দেখা দেবে এই জঙ্গলের লাল-মানুষেরা, কিংবা জাগুয়ার-কুমীরের দল।

বার্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমি ছেলেবেলায় ভালোবেসেছিলাম সমুদ্রকে, এখন আবার ভালোবাসলাম ব্রেজিলকে। আমিও কোনো দিন হয়তো এই কয়েক বছরের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবো না।

—ডরোথি-পিশির জন্তে মন কেমন না করলে, বললো মার্টিন, ব্রেজিল ছেড়ে হয়তো কোনো দিন যেতাম না।

বার্নি বললো, আবার যে কোনো দিন ফিরবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

সমুদ্র তার ঢেউয়ের গলায় ফিশফিশ করে কী বলে উঠলো যেন। হয়তো বা বার্নির কথাতেই সায় দিলো।

ওদের দুজনের চোখের সুমুখ থেকে কালো বিন্দুর মতো দক্ষিণ আমেরিকার দূর প্রান্তটি মিলিয়ে গেছে তখন।

—শেষ—

# তুলি-কলম-এর অনুবাদ

## অকূল পাথার ২৲

এক ঝড়ের রাতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে ছোট্ট একখানি জাহাজসমেত হারিয়ে গেলো একদল স্কুলের ছেলে। তাদের কীর্তি-কলাপ নিয়ে লেখা জুল ভার্নের বিস্ময়কর উপন্যাস Adrift in the Pacific-এর সার্থক অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ওল্ড কিউরিওসিটি শপ ১॥০

ছোট্ট মেয়ে নেল। তার কাহিনী যখন ধারাবাহিক ভাবে কোন কাগজে লিখেছিলেন দরদী কথাশিল্পী চার্লস ডিকেন্স, তখন পাঠকরা বার বার তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, নেলকে যেন মেরে ফেলা না হয়। সেই অপূর্ব উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত।

## অনেক আশা ১॥০

চার্লস ডিকেন্সের আর একখানি বিচিত্র উপন্যাস Great Expectations. একটি খুনে বদমায়েস আর একটি কিশোর মানুষের আশ্চর্য যোগাযোগের কাহিনী। সংক্ষেপে অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত।

## টম ব্রাউন ১৲

একখানি মাত্র কিশোর উপন্যাস লিখে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন টমাস হিউজেস—Tom Brown's School Days. বইখানি বাংলা দেশের Higher Secondary school-এর পাঠ্যপুস্তক। সুন্দর সহজ অনুবাদ করেছেন সাবিত্রী ভট্টাচার্য।

## রক্তরাঙা দিনে ১।০

ফরাসী বিপ্লবের রক্তক্ষরা অক্ষরে লেখা ভিক্টর হুগোর অমর উপন্যাস Ninety Threeর কিশোর-উপযোগী অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত।

## নাটকের গল্প গ্রন্থমালা

সেক্সপীয়রের: **মার্চেন্ট অব ভেনিস, টেম্পেষ্ট, ম্যাকবেথ, মিডসামার নাইটস ড্রিম, কিং লীয়র।** প্রত্যেকখানি দশ আনা মাত্র।

তুলি-কলম: ৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২